KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নর্থ রোড, যাদবপুর, কল-৩২
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
Title : অলিন্দ (ALINDA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : (গ্রীষ্ম সংকলন) (শরৎ সংকলন) (শীত সংকলন) (শীত সংকলন)	Year of Publication : ১৩৭৭ ১৩৭৭ ১৩৭৮ ১৪০০ Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

শীত সংকলন

১৪০০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

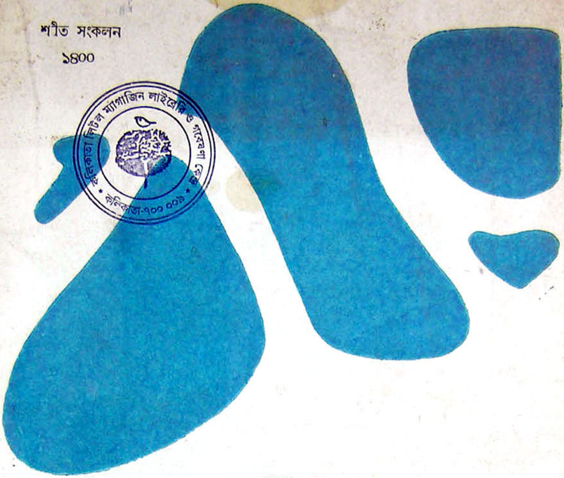

অলিন্দ

সম্পাদক

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অলিন্দ

ষান্মাসিক সাহিত্য-সংকলন

শীত ১৪০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, বটকৃষ্ণ দে, সুমিতা চক্রবর্তী, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাণিক রায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অভী সেনগপ্ত, কবিরুল ইসলাম, রত্নেশ্বর হাজরা, কালিকৃষ্ণ গুহ, গণেশ বসু, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, দেবী রায়, আশিস সান্যাল, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত রুদ্র, বাসুদেব দেব, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, দময়ন্তী গুপ্ত উইকল্যান্ডার, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, জয়তী রায়, প্রদীপচন্দ্র বসু, ভাস্বতী রায়চৌধুরী, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়, সুদেব সাহা, দীপ সাউ, পলাশ বর্মণ, অনুপকুমার দত্ত, অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা ভট্টাচার্য, কণা বসুমিশ্র, নির্মল বসাক, পার্থসারথী চৌধুরী, মঞ্জুভাষ মিত্র, রাণা চট্টোপাধ্যায় সুভদ্রা ভট্টাচার্য, বিজয়কুমার দত্ত, দেবদাস আচার্য, অজয় নাগ, কৃষ্ণা বসু, দীপক রায়, মালিনী ভট্টাচার্য, দীপশিখা পোদ্দার, সুজিত সরকার বিজয় মাখাল, অজিত বাইরী, বাপী সমাদ্দার, গৌরীশঙ্কর দে, অমিতেশ মাইতি, অমিতাভ চৌধুরী যশোধরা রায়চৌধুরী, স্বপন রায়, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন ঘাটী, কানাইলাল জানা, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, দেব চক্রবর্তী, শম্ভু বসু, সুদীপ চক্রবর্তী, সুহাস বসু, কুন্তল মণ্ডল, রাহুল রায়, সেখ মহিউদ্দিন, শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, শেফালী চক্রবর্তী, দীপকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী, কৌশিক ঘোষ, গৌতম হাজরা, গায়ত্রী গুপ্ত, দীপক কর, গোবিন্দ গোস্বামী, অভীক ভট্টাচার্য, বুবুন চট্টোপাধ্যায়, নিতাই জানা, নাসের হোসেন, নিভা দে, নীলাঞ্জন সিংহ, প্রণবকুমার মজুমদার, মউলি মিশ্র, অমরেন্দ্র গণাই কৃষ্ণসাধন নন্দী শ্যামলজিৎ সাহা, সুদীপ্ত মাজি, স্বপন শর্মা, মেঘ মুখোপাধ্যায় ঈশিতা ভাদুড়ী, স্বরূপ চন্দ, সেবাব্রত চৌধুরী, সুব্রত সিনহা, প্রদীপ মিত্র, অমৃত সাহা, গৌতম দাস, গৌতম ঘোষদস্তিদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সম্পাদক : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : মেরিঅ্যান দাশগুপ্ত

প্রকাশক : ডক্টর পার্থ দাশগুপ্ত

মুদ্রক : স্বর্ণাক্ষর

৩১৯/২ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া-১

দাম : পাঁচ টাকা

সম্পাদকীয়

কবিতা নানারকমের আছে, সেকথা আমরা জানি। ভালো কবিতাও তো অনেক রকম। কিন্তু আমি পাঠককে ভেবে দেখতে বলছি যারা উত্তর-আধুনিক কবিতায় বিশ্বাস করেন, মার্কসবাদ-জারিত উত্তর-আধুনিকতা, তাদের পক্ষে অন্য ধরনের কবিতায় সাড়া দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সৌভাগ্যের বিষয়, উত্তর-আধুনিকতা বা মার্কসবাদ সম্পর্কে অনেকের ধারণাই খুব স্পষ্ট নয়—সুতরাং তাদের যতীন বাগচীও ভালো লাগে, জীবনানন্দও খারাপ লাগে না, মণিভূষণ ভট্টাচার্য-র কবিতা শুনেও হাততালি দেন। এই উত্তর-আধুনিকতা একটি কট্টর কঠিন মতবাদ, তবে অলঙ্ঘনীয় নয় এই কারণে যে, যে যার খুশিমতো কবিতা লিখে সাধুবাদ তো পাচ্ছে, পুরস্কারও পেয়ে যাচ্ছে কখনও কখনও। পশ্চিমবাংলা কেন হাংগেরি বা চায়না নয়, আর বিশ্বজোড়া তৃতীয়ভুবনিক মার্কসবাদ কেন সবাই মানতে পারেন না, তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। ভালোভাবে অনেকে থাকতে পারছেন না সে-নিয়ে দুঃখ করা অনেক ভালো। যা আত্মগত, মগ্ন, কম্পমান, প্রতীক-চিত্রকল্পের কম্পমান আলোছায়া, তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় ক'রে যে টানটান শুকোতে দেয়া চামড়ার মতো কবিতা তৈরী হয়, তা-ই কিন্তু উত্তর-আধুনিক কবিতা। রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত ব্যাভিচারিণী পণ্যদ্রব্যের ফাঁকে ফাঁকে যে প্রতিবাদ রচিত হয়, তা-ই যদি এখনকার কবিতা হয়, তাহলে সে-ধরনের কবিতা পশ্চিমবাংলায় লেখেন একমাত্র শ্রী মণিভূষণ ভট্টাচার্য—আর কেউ নয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় গ্রাম থেকে শহরে আসা হাটুরেদের কথা লিখেছেন, কিন্তু তা-ও গোপন লিরিকতা আর প্রকাশ্য ব্যঙ্গের মিশ্রণে তৈরী অতি সাবলীল কবিতা, কমেডিও কিছুটা, কিন্তু বেশি নয়। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন অভিমানী সমাজমনস্ক কবিতা, বিজ্ঞাপন বিষয়ে লিখতে গিয়ে মুখ বিষয়ে লিখেছেন। ছড়ার ছন্দ তাঁকে জনপ্রিয় করেছে—"ছিন্নশির তিমির" আর "একা হও, একা হও, একা" আর "লোকে তো কোথাও যাবে, তাই আমি, এমন কিছু না", আর "তুমি তো তেমন গৌরী নও", "তোমাকে বকবো, ভীষণ বকবো আড়ালে" রচনা ক'রে কড়ি ও কোমলের যে কাজ করেছেন তা একেবারেই উত্তর-আধুনিক নয়। সিদ্ধেশ্বর সেন উপনিষদ ও মার্কসবাদ বিষয়ে কবিতা লেখেন, ভালোই তো লেখেন আমার মনে হয়, কিন্তু জনপ্রিয় নন। **Geoffrey Hill, John Logan** ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ধর্ম ও

মার্কসবাদকে মিলিয়েছিলেন। খারাপ কবি নন তাঁরা। যদিও গুণগত-ভাবে এমন কিছু কবিতা লেখেননি তাঁরা। অমিতাভ গুপ্ত পুরাণের **inter-textual** ব্যবহারকে উত্তর-আধুনিকতা বলেছেন, অন্য কিছু বললেও ক্ষতি হ'তো না। তিনি "ভোর"-এর মতো স্নিগ্ধ প্রতীকী কবিতা লেখেন, আর কখনও কখনও রাগী কবিতা। তিনি মূলত "আধুনিক" কবি, "উত্তর-আধুনিক" নন। তাহলে?

আমাদের মাথায় বিজ্ঞানজাত অনেক তত্ত্বের আমদানী ঘটছে—তা খারাপ নয়, কিন্তু মননের মগজে যা আছে আর চারপাশে যা লেখা হচ্ছে তার মধ্যে যদি কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহ'লে বাগবিস্তার করে কী হবে?

ধর্মের কথা উঠছে যখন, তখন অধর্মাচরণ করা উচিত না এ-বিষয়ে। Lucas তাঁর "The Abolition of Marx" গ্রন্থে লিখেছেন যে 'The parasites of emotion and religion have to be cut away so that the real values may emerge' (একটু এদিক ওদিক হ'তে পারে, বইটা হাতের কাছে নেই, তবে প্রায় নির্ভুল উধৃতি)। এক হিসেবে নিশ্চয় সত্য, কিন্তু পরগাছা ছাড়াও তো অন্য গাছ থাকে। ধরুন, ধর্ম বা আবেগ যদি কারো কাছে মহীরুহ মনে হয়? হতেও তো পারে। ধর্মান্ধতা বা আবেগাকুলতা নিশ্চয়ই পরিত্যজ্য, কিন্তু পরগাছা উপড়োতে গিয়ে দড়িগাছি দিয়ে গাছ কাটা যাবে না। নাকি যাবে?

প্রয়াত কবি শামসের আনোয়ার, প্রয়াত অধ্যাপক শ্রী সুবীর রায় চৌধুরী, আমেরিকান সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সাহিত্যিক শ্রী সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে করছি এ-মুহূর্তে। তাঁরা আকস্মিকভাবে অকালে বিদায় নিয়েছেন। আমাদেরই ক্ষতি। কবি শ্রী মানিক চক্রবর্তী-র কথা মনে পড়ছে এখন। কোনো কারণে "অলিন্দে" তৎকালীন সংখ্যায় তা জানানো হয়নি (সম্ভবত অনবধানতা), এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো ব'লে উল্লেখ করছি।

প্রসঙ্গত জানাচ্ছি এইটিই "অলিন্দ"-র শেষ সংখ্যা।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৩ নর্থ রোড, কলিকাতা-৭০০০৩২

পুরনো দিনের পত্র-পত্রিকা ও বাংলা কবিতা

সুমিতা চক্রবর্তী

কবিতার প্রতি মানুষের একটা বিশেষ ধরনের টান আছে যা ব্যবহারিক গদ্যের প্রতি নেই। তেমনভাবে ভাবতে শেখার আগেই মানুষ কথা বলতে শিখে যায় অর্থাৎ গদ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যা আগা-পাশ-তলা জানা, নিতান্ত ব্যবহারযোগ্য এবং দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে জড়ানো, তার সঙ্গে কোনো বিস্ময় মাখানো থাকে না। মৌখিক গদ্য নিয়ে আমাদের কোনো বিস্ময়বোধ নেই। সাহিত্যিক গদ্য, শৈল্পিক গদ্য আজ আমাদের মুগ্ধতা জাগায় কিন্তু সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার হয়েছে গদ্য লিখন অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর। প্রশাসন ও আইন-আদালতের প্রয়োজনীয় তথ্য নথিভুক্ত করবার জন্য, ধর্ম-উপদেশ দেবার জন্য, রাজনীতি-নগরনীতি চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষা লিপিবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন এবং যে-কোনো বিষয়ক তত্ত্ব আলোচনায় গদ্যের বেশ নিবিড় ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে অনেককাল আগে। প্রথম খ্রীষ্টাব্দে রোমের সাহিত্য-তত্ত্ববিদ কুইনটিলিয়ান তাঁর শিক্ষানিকেতনে ছাত্রদের যত্ন করে দিতেন বাগ্মিতার শিক্ষা। সেই গদ্য নির্দিষ্ট ছিল প্রশাসনের ও রাজনীতির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবার জন্য। জ্ঞান ও দর্শন চর্চাও একেবারে বাদ যেতো না। কিন্তু সৃজনী সাহিত্য গদ্য মাধ্যম গ্রহণ করেনি আরো অনেকদিন। সাহিত্য বলতেই বোঝাতো হয় কাব্য, না হয় নাটক।

লেখার প্রচলন হবার আগেই গান ও কবিতা এসে গেছে মানবসভ্যতায়। দিনানুদিনের ব্যবহারিক, অতি-পরিচিতের বৃত্তটিকে প্রথম থেকেই অস্বীকার করেছে কবিতা। কবিতা এসেছে মন্ত্র রচনায়, মায়াজাল বিস্তারের মানসে। তার উদ্দেশ্য ছিল লৌকিক—জনগোষ্ঠীর মঙ্গলবিধান ও অমঙ্গল দূরীকরণ। কিন্তু সেসব কবিতার উদ্দেশ্যটি অ-লৌকিক। তা দেবতা অথবা অপদেবতার অপার্থিব শক্তির পায়ে নিবেদিত। সেই মন্ত্রের মধ্যে অলৌকিক সংঘটনের প্রার্থনা ছিল নিহিত। তাই তার বাণীবিন্যাস ও সুর—দুইই কাজ চালানো মুখের ভাষার থেকে ছিল কিছুটা আলাদা। আর সেই স্বাতন্ত্র্যের প্রতি ছিল মানুষের ভয়-ভক্তি-বিস্ময় মেশানো এক মোহময় আকর্ষণ। বহুকাল পর্যন্ত মানুষ তার আনন্দ ও বেদনার স্ফুরিত প্রকাশের মাধ্যম রূপে কবিতাকেই আঁকড়ে ধরেছিল। আবার জ্ঞানচর্চা যখন ছিল মূলত শ্রুতি-নির্ভর তখন মনে রাখবার

প্রয়োজন নিতান্ত কাজের কথাকেও ছন্দে ও মিলে গেঁথে দেবার অভ্যাস ব্যাপক ছিল যথেষ্ট। ভারতে রাজপ্রশস্তি থেকে হস্তীবিদ্যা—সবই একসময়ে কাব্যাকারে রচিত হয়েছে। যাঁরা মুখের ভাষাকে কৌশলে সাজিয়ে 'কবিতা' করে ফেলতে পারতেন তাঁরা সমাজে চিরকালই পেয়েছেন এক আলাদা সম্মান। কারণ ভাষাকে ওভাবে সাজালে তার অঙ্গে লাগে নবীনতার আভা ; আর ভাষাকে ওভাবে সাজাবার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ শিক্ষাগত ও মানসিক যোগ্যতার।

যখন থেকে গদ্যে শুরু হয়েছে 'গল্প' লেখা তখন থেকেই কিন্তু পাঠকের চিত্ত জয়ের জন্য কবিতা আর আখ্যানের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা চলে আসছে যেন। গল্প-পিপাসু এক জাতের পাঠক আছেন যাঁরা কবিতায় তেমন সুখ পান না। তাঁরা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে বিন্যস্ত দেখতে চান যেখান থেকে পাওয়া যাবে কৌতুক, ইচ্ছাপূরণ, ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা যা তাঁদের লৌকিক জগতের অভ্যন্তরে ধরে রাখবে—কোনো ভাবলোক তাঁদের পাঠাতে চাইবে না। কবিতা তো সত্যিই 'কংক্রীট' কিছু বলে না। বলে ভাবের কথা, সাধারণত বলে উচ্চভাব ও নীতির কথা ; কবিতায় থাকে ভক্তির, প্রকৃতিমুগ্ধতার, মানবতার, ভাবাবেগের বাণী। কিন্তু গল্প-প্রিয় পাঠকের কাছে বাস্তব আখ্যানের বিনোদন-মূল্য বেশি। গল্প লেখা শুরু হতেই বোঝা গেল বহু পাঠক প্রস্তুত হয়ে ছিলেন গল্পের জন্য। রম্য গল্পের পাঠক সংখ্যাই সম্ভবত সর্বাধিক।

তবুও কবিতার আকর্ষণ থেকে গেল। থেকে গেল এক অর্থে বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের কাছে ; অন্য অর্থে বহু পাঠকের কাছে কবিতা এল এক ধরনের আলাদা ভালো লাগার হাতছানি নিয়ে। সেই ভালো লাগার মধ্যে একটু যেন মায়া, একটু মুগ্ধতা, একটু আলাদা সম্ভ্রম—যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। গল্প যদি হয় মুক্তোদানা—নিটোল, কবিতা তবে জলবিন্দুতে আলো—কণার সাতরঙে প্রতিসরিত দ্যুতি। হাতের মুঠোয় তা ধরা যাবে না কিন্তু তা যে সুন্দর তা অস্বীকার করবে কে ?

কাজেই কবিতার জায়গা মানুষের মন থেকে কখনো অপসৃত হল না। ভাষা নামক যে ব্যাপারটিকে বহু মানুষ সারা জীবন ধরে আদৌ আয়ত্ত করতে পারে না, পারে না দু'কলম গুছিয়ে লিখতে অথবা সাজিয়ে কথা বলতে, সেই ভাষাকেই অবলীলায় বশ মানাতে পারে যারা—ছন্দে গেঁথে, মিল বসিয়ে ভাষাকে যারা ঝংকৃত ও মুখর করে তুলতে পারে ; বিন্যাসের অত শর্ত মেনেও বলবার

কথাটিকে সুন্দরতর করে সাজিয়ে দিতে পারে—সেই কবিজাতীয় মানুষদের প্রতি সাধারণ পাঠকের সম্ভ্রমবোধও থেকে গেল চিরকাল।

প্রতিষ্ঠিত ভাষাগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কখনো কখনো সামাজিক উন্নতি ও শিক্ষার প্রসারের এমন একটা স্তর দেখা দেয় যখন সাধারণ পাঠকের সংখ্যা সেখানে অনেক বৃদ্ধি পায়। সেই পাঠকেরা লেখার মাধ্যমে জানতে চায় অনেক কিছু, আবার আনন্দও পেতে চায় লেখ্য শিল্পের আস্বাদে। সমাজ ব্যবস্থার ঠিক সেই স্তরটিতেই দেখা দেয় পত্র-পত্রিকা। সাধারণ পাঠকের সংখ্যা যত বাড়ে ততই বাড়ে সাময়িক পত্র। পাঠককে সমাজ-পরিবেশ, বিশ্ব-পরিস্থিতি, জাগতিক জ্ঞানসমূহের সঙ্গে পরিচিত করাতে চায় পত্রিকা ; সাহিত্য-পাঠের আনন্দদানও অনেক পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। পাঁচ মিশেলি উদ্দেশ্য নিয়েই প্রকাশিত হয় অধিকাংশ সাময়িক পত্র। সর্ব অবস্থায় সাময়িক পত্র তার পাঠকদের সচেতন রাখতে চায়, আর পাঠককে আকর্ষণ করতে চায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা ভাষায় সাময়িক পত্রের উদ্ভব। যখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালির সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বাংলা ভাষায় পুরোনো পত্র-পত্রিকায় কবিতার কী স্থান ছিল, কীভাবে কবিতাকে গ্রহণ করতেন উনিশ শতকের পাঠক-সমাজ—তার কিছু পরিচয় আমরা এখানে দেখাবার চেষ্টা করব।

প্রথম কয়েকটি বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল জ্ঞান ও সংবাদ বিতরণের উদ্দেশ্য নিয়ে। যে ভাষায় সবেমাত্র লেখ্য গদ্য গড়ে উঠছে সে ভাষার ক্ষেত্রে এই ঘটনাই স্বাভাবিক। ১৮১৮ সালে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' (মাসিক), 'সমাচার দর্পণ' (সাপ্তাহিক), 'বাঙ্গাল গেজেটি' (সাপ্তাহিক) পত্রিকায় বিভিন্ন খবরই প্রাধান্য পেয়েছে ; ক্বচিৎ খবরগুলি নিতান্ত সমকালীন না হয়ে ছোটো তথ্যভিত্তিক নিবন্ধ-রূপ গ্রহণ করত। কিন্তু কবিতার জায়গা ছিল না সেসব পত্রিকায়। ১৮১৯-এর 'গস্‌পেল ম্যাগাজিন' আর ১৮২১-এর 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ছিল যথাক্রমে খ্রীস্ট্রীয় ও হিন্দু ধর্ম-দর্শন বিষয়ক পত্রিকা। 'সম্বাদ কৌমুদী'-র (১৮২১) চরিত্র প্রথম একটু আলাদা হয়ে দাঁড়ায়। সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি জনমত গঠনে, সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করেছিল পত্রিকাটি। রামমোহন রায় কিছুটা যুক্ত ছিলেন এই পত্রিকার সঙ্গে। লেখা প্রকাশিত হত সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে। পত্রিকায় ঘোষিত হয়েছিল—লোকহিত সাধনই এই পত্রিকার উদ্দিষ্ট। কিন্তু কবিতা ছিল না কোথাও। রক্ষণশীল

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগতিমুখীন 'সম্বাদ কৌমুদী'-র সংস্রব ছেড়ে ১৮২২-এ 'সমাচার চন্দ্রিকা' (সাপ্তাহিক) প্রকাশ করলেন এবং লিখতে লাগলেন সতীদাহের সপক্ষে। তিনিও কবিতার কথা ভাবেননি। কাব্য, পাঁচালী, ভক্তিগীতি আর কবিগানের বাইরে বাংলা কবিতা তখনও গড়ে ওঠেনি।

এরও পাঁচ বছরে পরে ১৮২৯ সালে প্রকাশিত হল 'বঙ্গদূত' (সাপ্তাহিক)। প্রথমে সম্পাদক ছিলেন নীলরত্ন হালদার, পরে হলেন ভোলানাথ সেন। পত্র-পত্রিকাগুলির শিরোনামের ঠিক তলায় একটি করে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত থাকতো প্রায়ই। সেই শ্লোকের মধ্যেই পত্রিকার লক্ষ্য ব্যক্ত করা হত। অনেক পত্রিকার শ্লোক সম্পাদকেরাই রচনা করতেন বলে মনে হয়। যেমন 'সমাচার দর্পণ'-এর শ্লোকটি ছিল—

দর্পণে মুখ সৌন্দর্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

'সম্বাদ কৌমুদী'-তে লেখা হত—

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥

এই রীতি গৃহীত ছিল প্রায় সর্বত্র। লেখার শৈলীও ছিল প্রায় একই রকম। কিন্তু 'বঙ্গদূত'-এ একটি সংস্কৃত দ্বিপদীর নিচে একটি বাংলা ত্রিপদী ছন্দের কবিতা মুদ্রিত করলেন সম্পাদক। সম্ভবত এই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অগেয় শিরঃ-কবিতাটিই বাংলা সাময়িকপত্রে স্থানপ্রাপ্ত প্রথম বাংলা কবিতা।

অন্য অন্য দূতগণ, সামান্য যে বিবরণ,
সেইমাত্র কহে সংগোপনে।
তাহাতে সচরাচরে, তত্ত্ব না জানিতে পারে,
মুগ্ধ রহে মর্ম্ম অন্বেষণে॥
অতএব সাধারণ, সর্বজন প্রয়োজন,
স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভূত।
সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়,
হিতকারী এই বঙ্গদূত॥

একটি সুস্পষ্ট মাননিক বক্তব্যকে ছন্দে মিলে গেঁথে প্রাঞ্জল-প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে এই কবিতায়। এ কবিতা অ-ধর্মীয়, অ-পৌরাণিক, আদিরস সম্পর্ক-শূন্য। এতখানি উদ্দেশ্যমূলকতা থেকে ভালো কবিতা হয় কিনা এ প্রশ্ন যদি

তোলেন কেউ, তাহলে প্রতিপ্রশ্ন থাকে আজও কি কোনো কোনো মৃত্যু দুর্ঘটনা প্রশাসনিক বা সামাজিক অন্যায়, এমনকি কারো জন্মদিন বা সংবর্ধনা নিয়েও কবিতা লেখা হচ্ছে না? 'বঙ্গদূত'-এর দৌত্যে উনিশ শতকের মধ্যভাগের বহু সাময়িক পত্রেই বাংলা শিরঃকবিতা দেবার রেওয়াজ চালু হয়েছিল।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া গেল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' (সাপ্তাহিক, প্রথম প্রকাশ ১৮৩১) থেকে—

লোকের অজ্ঞানরূপ হয় অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥

সংস্কৃত শ্লোক দেবার রীতি বজায় ছিল আরো অনেকদিন। তবে বাংলা কবিতা দেবার রীতিও গৃহীত হয়।

১৮৩১ সালটি বাংলা সাময়িক পত্রের জগতে বিশিষ্ট, কবিতার গুরুত্বের দিক দিয়েও তাৎপর্যময়। ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'। প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে প্রতি শুক্রবার প্রকাশ পেত, অচিরেই দৈনিক হয়ে যায়। বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক। এই পত্রিকাতেই সচেতন ভাবে দেখা দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কবিতা ও কবিতা মনস্কতা নিয়ে। যে অর্থে একালের কবিতা সুরবর্জিত, ইহবাদী, সমাজমনস্ক, বিশ্লেষণী মনন সম্পন্ন, মর্ত্যরস জারিত —সেই বাংলা কবিতার জনক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর কাব্যভাষা ও শৈলী যতই আমাদের কাছে আজ অ-সূক্ষ্ম মনে হোক, প্রচলিত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিদ্রূপ রসের কবিতা, সমাজ প্রেক্ষণমূলক মানবমুখী কবিতা লিখলেন তিনি; অবাধে ব্যবহার করলেন সব ধরনের শব্দ। বাংলা কবিতার চেহারাই গেল বদলে। মধ্য উনিশ শতকের বাঙালির জীবনযাপন, তার সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত জীবন্ত হল তাঁর কবিতায়। শাসক শ্বেতাঙ্গদের চরিত্র; মসীজীবী ও ও ইংরেজ অনুকারী বঙ্গসন্তান; বিধবা বিবাহ স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশ্ন; বাঙালির উৎসবাদির প্রসঙ্গ আছে তাঁর রচনায়। এ সবই বেরিয়েছিল 'সংবাদ প্রভাকর'-এ। ঈশ্বরচন্দ্র আমাদের প্রথম নাগরিক কবি। ব্রিটিশ উপনিবেশ-শহর রূপে কলকাতাকে তাঁর কবিতায় প্রথম পাই। ইংরেজ বণিকের প্রশাসন ব্যবস্থায় ভেঙে পড়ছে গ্রামীণ উৎপাদন পদ্ধতি। টাকার লেনদেন সবই চলছে শহরে। গ্রামের মানুষ কলকাতায় আসছে কিছুটা বিলাসের টানে, কিছুটা নিরুপায় হয়ে গ্রাসাচ্ছাদন জোটাবার জন্য। পুরোনো রচনা-রীতির যমক অনুপ্রাসের চকমকি ছিটোনো ভাষাতেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আপাত-লোভন শহরের

এই নিষ্ঠুর ও খাদকভূমিকার চিত্র সমন্বিত আধুনিক কবিতা লিখতে পেরেছিলেন সেই কবিতা স্থান পেয়েছিল 'সংবাদ প্রভাকর'-এ—

চার টাকা মন দর উঠেছে নূতন চেলে।
কত আর চলবো নূতন চেলে?
যাদের নাহি পুঁজি পাটা, গিয়ে বেলেঘাটা!
বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে॥

(নীলকর পালা)

বঙ্কিমচন্দ্র 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত' প্রবন্ধে লিখেছেন—"তখন প্রভাকর উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত।" বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও ছিলেন এই ব্যগ্র বালকদের একজন। তাঁর প্রথম সাহিত্যসৃজন 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় গুপ্ত কবির অনুসরণে রচিত কবিতা।

'সংবাদ প্রভাকর'-এ ঈশ্বরচন্দ্র তার কবিতা মনস্কতার আরও প্রমাণ রেখেছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ধান চালিয়ে বাংলার প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত কবিতা ও জীবনী সংগ্রহ করে মুদ্রিত করেছিলেন। বাংলা কবিতার গবেষণায় প্রথম ইতিহাস-প্রয়াস এই পত্রিকায়। ১৮৫২ সালে এই পত্রিকায় গ্রে ক্যাম্পবেল, পোপ প্রমুখ ইংরেজ কবিদের কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন সম্পাদক। বাঙালি পাঠককে পাশ্চাত্য কবিতার সঙ্গে পরিচিত করাই উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। সর্ব অর্থেই 'সংবাদ প্রভাকর' সাময়িক পত্র বাংলা কবিতার প্রথম প্রদীপটি জ্বালিয়েছিল।

১৮৩১ থেকে এই পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ পেলেও নবীন যুগের বাঙালি কবিদের প্রধান অশ্রয় রূপে 'সংবাদ প্রভাকর' গণ্য হল ১৮৫৩ সাল থেকে। এই সাল থেকে ঈশ্বরচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকর' এর একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশ করতে শুরু করেন। সেটি সর্বাংশেই ছিল সাহিত্য-পত্রিকা। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, অক্ষয়কুমার দত্ত সকলেই নিয়মিত কবিতা লিখতেন এখানে। নিয়মিত সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনা প্রকাশিত হত। অনেকেই ১৮৭২-এর বঙ্কিম সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কে প্রথম বাংলা সাহিত্য-পত্রিকা বলে নির্দেশ করেন। তার অনেক আগেই মাসিক 'সংবাদ প্রভাকর' পেয়েছিল প্রায় সাহিত্য পত্রিকার চরিত্র। তবে 'বঙ্গদর্শন'-এর সমচ্ছ মান ও গুরুত্ব অবশ্যই অর্জন করতে পারেনি

এই পত্রিকা। এই 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সময় ১৮৫৩ ধরাই সঙ্গত হবে। কিন্তু উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে অর্থাৎ ১৮৩১ থেকে ১৮৪০-৪২ পর্যন্ত সময়ে 'সংবাদ সুধাসিন্ধু', 'সংবাদ গুণাকর', 'সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী', 'সংবাদ সৌদামিনী', 'সংবাদ ভাস্কর' ইত্যাদি অনেক বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় সব কয়টিতেই নিজের স্থান করে নিয়েছে কবিতা। সেসব কবিতার মান উল্লেখ-যোগ্য নয় তা বলা বাহুল্য।

এগুলির মধ্যে 'সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী' (১৮৩৮)-র একটু অভিনবত্ব ছিল। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে বিজ্ঞাপন—সবই লেখা হত পদ্যে। সে পদ্যও অত্যন্ত অদ্ভুত। একটি ঘোষণা ও একটি সংবাদের উদাহরণ দেওয়া যাক—

আমাদের যে বিজ্ঞাপন দিবে গো।
তাহার পঙক্তির প্রতিমূল্য চারি আনা গো।

১৮৩৮ সালের পক্ষে বিজ্ঞাপনের হার খুবই চড়া ছিল বলতে হবে।

* * *

চারি ঘোড়ার গাড়ী চোড়ে গতদিনে বেকালে গো।
গিয়াছেন গবনর সাহেব চানকের বাগানে গো॥

প্রতি পঙক্তির শেষে একটি করে 'গো' যুক্ত করে তাকে পদ্য হিসেবে দাবি করাও একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। কিন্তু পদ্য ভাষার প্রতি সেকালের সম্পাদক ও পাঠকদের আগ্রহের একটু প্রমাণ আছে এই ঘটনাটিতে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন পার্বতীচরণ দাস।

কবিতার মান সম্পর্কে ক্রমে চেতনা বাড়তে লাগল। নব্য ধ্রুপদী যুগের ইংরেজি কবিতা পাঠে অভ্যস্ত উনিশ শতকের বাঙালি কবিতা রসিকেরা এটুকু বুঝতে পারছিলেন যে ভালো বাংলা কবিতা লেখা হচ্ছে না। 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ পায় ১৭৬৪ শকাব্দের আষাঢ় মাসে (১৮৪২ জুন-জুলাই)। সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় রচনায় লেখা হয়েছিল—"এই ক্ষণে কবিতার রীতি আমার দিগের ভাষায় উত্তম নাই, অতএব তাহার প্রতি অধিক যত্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধে সর্ব্বদাই সাধারণ লোকদিগকে তর্কদ্বারা সাবধান করিব, এবং উত্তম ২ কবিতা যিনি লিখিয়া প্রেরণ করিবেন তাহা অবশ্য আমারদিগের বিচারের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।"

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৩-এ। ধর্ম

ও নীতিমূলক প্রবন্ধ এবং ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন সংবাদ প্রাধান্য পেত এই পত্রিকায়। কিন্তু কিছু কিছু ভ্রমণকথা ও 'বিশুদ্ধ' ভাবাত্মক কবিতাও স্থান পেয়েছে প্রথম থেকেই। দীর্ঘজীবী পত্রিকাটিতে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বহু ব্যক্তির কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। মেয়েরাও লিখতেন। এই পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল মধুসূদনের বিখ্যাত 'আত্মবিলাপ'—'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়—' কবিতাটি তিনি পাঠিয়েছিলেন বন্ধু রাজনারায়ণকে। রাজনারায়ণ তা প্রকাশ করেন 'তত্ত্ববোধিনী' তে (আশ্বিন, ১৭৮৩ শকাব্দ, ১৮৬১)।

কবিতা সর্বদাই উচ্চ ভাবের বাণীরূপ হয়ে থাকত না। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল 'সংবাদ ভাস্কর'। গৌরীশংকর তর্কবাগীশ সম্পাদিত এই পত্রিকাটি বরাবরই ছিল কিছু অতি বিদ্রূপপরায়ণ ও শালীনতাবোধহীন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশংকর তর্কবাগীশ পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। কটূক্তি করবার ক্ষমতায় কম যেতেন না কেউই। ১৮৪৬-এ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'পাষণ্ড পীড়ন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন তর্কবাগীশের বিরুদ্ধতা করবার উদ্দেশ্যে। গৌরীশংকর তর্কবাগীশও পাল্টা প্রকাশ করলেন 'সংবাদ রসরাজ'। ১৮৪৭ সাল থেকে এই দুটি পত্রিকার মধ্যে তুমুল কবিতা-যুদ্ধ শুরু হল। কুৎসাপূর্ণ অশ্লীল কবিতায় ব্যক্তিগত আক্রমণ চলতে লাগল অবাধে। সেদিনের বাঙালী পাঠক কিন্তু এই অভদ্রতায় চুপ করে ছিলেন না। একযোগে কবিতার এই পঙ্কিল প্রয়োগের নিন্দা করেছিলেন সমকালীন প্রতিটি পত্রিকার সম্পাদক। কিছুকাল পরে দুটি পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক এই মুহূর্তে বাংলা সাময়িক পত্রের জগতে দেখা যায়—কবিতায় না হলেও গদ্যে অনেক সময়ে কবিরা ও সম্পাদকেরা পরস্পরকে কিছু কাদা ছোঁড়েন। এ-কালে কিন্তু সেই অভদ্রতার প্রতি যথোচিত তিরস্কার বর্ষণে কোনো তৃতীয় পক্ষ এগিয়ে আসেন না সহজে। হয়তো আমরা এখন অতিরিক্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা সচেতন বলে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে অনিচ্ছুক কিংবা উদাসীন—অথবা সাবধানে বাঁচিয়ে চলি নিজেদের—এমনও হতে পারে।

এইখানে আমরা আবার ফিরে যাবো 'সংবাদ প্রভাকর'-এর আলোচনায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দৈনিক সংবাদ সাময়িকী সম্পাদনা করে চলেছিলেন আর মনে মনে লালন করছিলেন এক সাহিত্য-পত্রিকার স্বপ্ন—বিশেষভাবে যা হবে কবিতারই জন্য সক্রিয়। মাঝখানে তিনি ১৮৪৭ থেকে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন যেখানে প্রধান স্থান পেয়েছিল কবিতা।

পত্রিকাটির উল্লেখ পাওয়া গেছে বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু সম্পর্কিত প্রবন্ধে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম রচনা 'মানবচরিত্র' নামে একটি কবিতা। এই সংবাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"অন্যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না। কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যতদিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণ গলিত না হইয়াছিল, ততদিন উহাকে ত্যাগ করি নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ে বালক মাত্র। তাঁর সাহিত্য-বোধের স্ফুরণে আমাদের অদেখা ঐ পত্রিকার অদেখা কবিতাটির গুরুত্ব আমাদের স্বীকার করতে হবে।

১৮৫৩ সালে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর মাসিক সংস্করণটিকে পুরোপুরি সাহিত্য-পত্রিকা রূপে প্রকাশ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সেই পত্রিকার কবিতা-প্রতিযোগিতায় কবিতা লিখে পারিতোষিক পেলেন হুগলি কলেজের কিশোর ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র। কবিতাটির নাম 'কামিনীর প্রতি উক্তি'। ১৮ মার্চ ১৯৫৩-তে কবিতাটি দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তী দু'বছর ধরে এই পত্রিকায় অনেক কবিতা লিখেছিলেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব ছিল সেই সব কবিতায়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের কবিত্ব তাঁর উপন্যাসগুলিতে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই কবিত্বের প্রথম চারণভূমি ছিল 'সংবাদ প্রভাকর'।

সেই সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ পায় ১৮৫১-তে। এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই সময়ের বিশিষ্ট বিদগ্ধ-মণ্ডলী। এই পত্রিকায় জ্ঞানগর্ভ আলোচনা বা নীতি উপদেশ ও সংবাদ সরবরাহকে প্রধান লক্ষ্য বলে বিবেচনা করা হয়নি। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন অথচ সুরুচির মান বজায় রাখা। প্রথম সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। প্রথম 'সচিত্র' এই মাসিকপত্রে উপন্যাস, মজার গল্প, নানা ধরনের অনুবাদ, গ্রন্থ-সমালোচনা ও কাব্য-কবিতা প্রকাশিত হত। বাংলা কবিতায় নতুন যুগ আনার কাজে যে দায়িত্বশীল ভূমিকা এই পত্রিকায় পালিত হয়েছিল তার কোনো তুলনা নেই। মধুসূদন তখনও দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেননি। অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্য লিখতে শুরু করেছেন—'তিলোত্তমা সম্ভব'। তার প্রথম সর্গটি প্রকাশ পেল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-তে ('১৮৫৯ জুলাই-আগস্ট)। পরের সংখ্যায় প্রকাশ পায় দ্বিতীয় সর্গটি। তারপরেই সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে সেটি মুদ্রিত হয়। প্রথম সর্গটি মুদ্রিত হবার সময়ে কবির নাম

সেখানে দেওয়া হয়নি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন প্রথম সর্গটির সঙ্গে—"কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্যটি প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অন্ত্য যমকের পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।"

নতুন ছন্দের এই পরীক্ষাকে, দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, একযোগে স্বাগত জানিয়েছিলেন সমকালীন পত্রিকাগুলির সম্পাদক ও কাব্য-আলোচকবৃন্দ। বাংলার কাব্যাকাশে এক মহৎ প্রতিভার আবির্ভাব হতে যাচ্ছে—সেই গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণ চিনে নিতে ভুল করেননি তাঁরা।

সেই সময়ে প্রতিটি পত্রিকায়, সহযোগী পত্রিকাগুলির কোথায় কী প্রকাশিত হচ্ছে তার খোঁজ রাখা হত। নিরপেক্ষ সমালোচনার একটা বাতাবরণ ছিল। পরস্পর সম্পর্কে উদাসীনতা ছিল না একেবারেই। সেই তুলনায় আজ সাহিত্য-সাময়িকীগুলি অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক বলে মনে হয়। মধুসূদনের এই আত্মপ্রকাশকে যে-সব পত্রিকা স্বাগত জানিয়েছিল তাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম 'সোমপ্রকাশ'।

১৮৫৫ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে দেখা গেল সাময়িক পত্রের মধ্যে দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটি ধারায় সমাজ-প্রসঙ্গ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম এবং দর্শন বিষয় প্রাধান্য পাচ্ছে; অন্য ধারায় প্রধান হয়ে উঠেছে সাহিত্য। তারই মধ্যে যে-সব পত্রিকায় সব রকম বিষয়ই থাকতো তাদেরই অন্যতম 'সোমপ্রকাশ'। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ খুবই যত্ন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ নিয়ে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে শুরু করেন ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে। এখানে সংবাদ, রাজনীতি প্রসঙ্গ ও বিভিন্ন ধরনের আলোচনা থাকতো। সাহিত্য-আলোচনার স্থানও ছিল প্রশস্ত। বিশেষভাবে সমকালীন কাব্য আলোচনায় 'সোমপ্রকাশ'-এর অগ্রহ দেখা দেখা যায়। সর্ব সময়েই আলোচনার ভাষাকে শালীন ও সুরুচি-সম্পন্ন করে তোলার দিকে সজাগ ছিলেন সম্পাদক। 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের আলোচনায় তিনি লিখেছিলেন—"বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্যগুলি ব্যাতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে।…এখন দিন দিন

লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে সন্দেহ নাই।" (৬ আগস্ট, ১৮৬০)। যথাসময়ে 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্যদ্বয়ের সপ্রশংস সমালোচনা 'সোমপ্রকাশ'-এ ছাপা হয়েছিল। মধুসূদনের 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছিল 'সোমপ্রকাশ'-এ (জুন ১৮৬২)। নবীন কবিকে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে পত্রিকাটির প্রয়াস ও সাফল্য অস্বীকার করা যায় না।

কবিতার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য আরো কিছু কিছু পত্রিকার মধ্যে ছিল পাক্ষিক 'সুবোধিনী'; ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল চুঁচুড়া থেকে। অষ্টাদশ শতকীয় ইংরেজি কবিতার অনুকরণে কবিতা প্রকাশিত হত সেখানে। ছাপা হয়েছিল গুলিস্তাঁ-র অনুবাদ।

'সৌদামনী' নামে একটি পত্রিকা ১৮৫৯ সালে অর্ধ-সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশ পায় শ্যামাচরণ সান্যাল ও বিপিনবিহারী সরকারের যুগ্ম সম্পাদনায়। সব-কিছুই থাকত তাতে কিন্তু কবিতা থাকত বেশি।

খুবই উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ছিল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পূর্ণিমা'—প্রকাশ পেত প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'-তে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"বিহারিলাল অল্প বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিজের ও বন্ধুবান্ধবের রচনা প্রকাশের সুবিধার্থে তিনি একখানি মাসিক পত্রিকার অভাব অনুভব করিতেছিলেন।" এই অভাব পূরণের জন্যই 'পূর্ণিমা'-র প্রকাশ। ঠিক এই কারণেই আজও অধিকাংশ কবিতাবিষয়ক ছোটো পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'শতভিষা', 'কৃত্তিবাস'. তারও আগের 'প্রগতি', 'পূর্বাশা', 'কবিতা'—সবারই মূলে কিছুটা এই কারণটি ছিল।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ছিল 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ'। ১৮৫৬ সালে সরকারি পরিচালনায় প্রকাশিত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন রেভারেন্ড ও' ব্রায়ান স্মিথ। সব রকম সংবাদ এবং জ্ঞান ও ভাবনা-উদ্দীপক আলোচনার জন্যই পত্রিকাটি নির্দিষ্ট ছিল। তবে সহ সম্পাদক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যানুরাগের কারণে বাংলা কবিতার চর্চায় নিজের স্থান করে নিয়েছিল পত্রিকাটি। 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' নামে একটি কবিতার ভূমিকায় রঙ্গলাল পাশ্চাত্য কবিতার ভাব বাংলা কবিতায় গ্রহণ করা বিষয়ে সুচিন্তিত এবং অনুকূল অভিমত প্রকাশ করেছিলেন—"অনেকে কহেন, ইউরোপীয় কবির ভাব

এতদ্দেশীয় ভাষাসমূহে সংগ্রহ করা অসম্ভব কার্য্য, কিন্তু আমরা এ কথা সর্বতোভাবে স্বীকার করি না।...আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই ইউরোপীয় উপাদেয় মানসিক ভোজ্য, কবিতা প্রভৃতি কি এতদ্দেশীয় জনগণের রুচি অনুসারে এতদ্দেশীয় নিয়মে প্রস্তুত করা যাইতে পারে না?" মনে রাখতে হবে, মধুসূদন তখনও বাংলার কাব্যাকাশে উদিত হননি। তখনও সংস্কৃতানুসারী কাব্যরীতির অন্যথা সম্ভব বলে অধিকাংশ পাঠক মনে করতেন না। মধুসূদনের আগেই রঙ্গলাল পাশ্চাত্য কবিতার শক্তি এবং সেই রীতি অনুসরণে বাংলা কবিতার উন্নতির কথা ভেবেছিলেন। এই পত্রিকাতেই তাঁর ভাবনার চিহ্ন ধরা পড়েছিল। ১৮৬৬-তে এই পত্রিকার সম্পাদক হন প্যারীচরণ সরকার; ১৮৬৮-তে সম্পাদনার কার্যভার গ্রহণ করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। সেই সময় থেকে 'এডুকেশন গেজেট' প্রকৃতপক্ষেই নবীন কবিদের সবচেয়ে বড় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের খণ্ড কবিতা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। নবীনচন্দ্রের প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয় এখানে—মুদ্রিত হয় হেমচন্দ্রের বিখ্যাত 'ভারত সঙ্গীত'—

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন, এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

এই কবিতা ছাপা হলে (৭ শ্রাবণ, ১২৭৭) সরকারের তরফ থেকে সম্পাদকের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছিল। মধুসূদনের 'হেক্টর বধ' কাব্যটি পড়ে বিমুগ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মধুসূদনকে একটি চিঠি লেখেন এবং সেই চিঠিটি তিনি ছাপিয়ে দেন 'এডুকেশন গেজেট'-এ (২৬ এপ্রিল, ১৮৭১)। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বহু কবি ও সমালোচকরাই পত্রাকারে সাহিত্য সমালোচনা করেছেন। সেইসব পত্র-প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিতও হয়েছে অবিরল। এখান থেকেই হয়তো সেই রীতির সূচনা।

যাকে বলতে পারি উনিশ শতকের ষাটের দশক অর্থাৎ ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত সময়-পর্ব—সেই কাল-পরিসরে অব্যাহত ছিল সাময়িক পত্রে কবিতার জয়যাত্রা। আলাদা করে কবিতা-প্রধান পত্রিকার কথা ভাবা হয়েছে। কেবলই কবিতা নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনাও করা হয়েছে। সেই মাসিক পত্রিকা 'কবিতা কুসুমাবলী'—প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে ১৮৬০-এর মে মাসে।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র, প্রসন্নকুমার সেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার পত্রিকাটির পরিচালক ছিলেন; প্রথম এক বছর সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। বিশেষ উল্লেখ্য, এর আগে ঢাকায় কোনো সাময়িক পত্র ছিল না। এই কবিতা-পত্রিকাটিই ঢাকার প্রথম সাময়িক পত্র। প্রথম দুটি সংখ্যায় ছিল কেবলই কবিতা। তৃতীয় সংখ্যায় সম্পাদক রচনা করেছিলেন 'কবিতা আলোচনার আবশ্যক' নামে প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—"বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষ সাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।" এ জাতীয় সম্পূর্ণ কবিতা ভিত্তিক প্রবন্ধ তখন বেশি লেখা হত না। কবিতার প্রতি পাঠকদের আগ্রহ জাগাবার জন্য অনেক পরে ১৯৩৫-এর 'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুকে আমরা এরকম প্রবন্ধ লিখতে দেখেছি পরপর।

কৃষ্ণচন্দ্র স্বকালে সুপরিচিত কবি ছিলেন। তাঁর কবিতা রচনার প্রেরণা এসেছিল পূর্বজ সাময়িক পত্র 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ রসরাজ' পাঠে—একথা জানিয়েছেন নিজেই। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'-এ কবিতা লিখেই তাঁর আত্মপ্রকাশ। দেখা যাচ্ছে ১৮৬০-এর মধ্যেই সাময়িক পত্রিকায় বাংলা কবিতার এতখানি ঐতিহ্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, নতুন কবিকে প্রতিষ্ঠিত করবার উপযোগী আবহ বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল সেখানে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'সদ্ভাবশতক' (১৮৬১) কবিতা-সংকলনের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। কাল-ব্যবধান অতিক্রম করে তাঁর কবিতা—"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে / কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।" কিংবা "যে জন দিবসে মনের হরষে / জ্বালায় মোমের বাতি।"—ইত্যাদি পৌঁছে গেছে আমাদের সময়ে। 'সদ্ভাবশতক'-এর অধিকাংশ কবিতাই 'কবিতা কুসুমাবলী'-তে ১৮৬০-এ প্রকাশ পেয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ভাল ফারসি জানতেন। মর্মজ্ঞ ছিলেন হাফেজ ও সাদী-র কবিতার। 'সদ্ভাবশতক'-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, পূর্বোক্ত কবিদ্বয়ের রচনার 'মর্ম্মমাত্র' গ্রহণ করে বাংলা কবিতাগুলি রচিত, তবে 'স্থানে স্থানে স্বকল্পিত ভাবাদিও আছে।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র সেই সময়ের একজন বিশিষ্ট কাব্যানুরাগী পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন। এই দশকে তিনি বেশ কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেন। প্রত্যেকটিতেই কবিতার স্থান ছিল সবার উপরে। চিত্তরঞ্জিকা' (মাসিক, মে ১৮৬২) ছিল সম্পাদকীয় ঘোষণা অনুসারে 'সদ্ভাব ও রসপূর্ণ পদ্যময়ী' পত্রিকা; 'অবকাশরঞ্জিকা' (মাসিক, সেপ্টেম্বর ১৮৬২) ছিল কবিতা প্রধান;

'কাব্যপ্রকাশ' (মাসিক, জানুয়ারী ১৮৬৪)-এর প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক জানিয়েছিলেন "বাঙ্গালী সাহিত্য সংসারে অপেক্ষাকৃত সুশ্রীকতা সম্পাদন করাই পত্রিকার উদ্দেশ্য, আর 'কাব্য প্রকাশ' সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—পত্রিকা-মধ্যে পদ্যের ভাগই অধিক ।" (৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪) । ১৮৭০ সালে হরিশ্চন্দ্র প্রকাশ করেন 'মিত্র প্রকাশ' নামে মাসিক পত্র । তার প্রথম সংখ্যার (মে ১৮৭০) বিশেষ ভাবে কবিতার প্রতি সম্পাদকের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়—"আমরা বরাবর বঙ্গ সাহিত্যের পক্ষপাতী,…যাহাতে বঙ্গভাষার উন্নতি, বঙ্গীয় কবিদিগের কাব্য কলাপের উন্নতি এবং পরিচয় সাধারণ্যে বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয়, 'মিত্র-প্রকাশ' সর্ব্বথা তৎপ্রতি অবহিত থাকিবে ।" বাংলা সাময়িক পত্রে কবিতার স্থান ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য একসময়ে বুদ্ধদেব বসু যে-চেষ্টা করেছিলেন তারই পূর্বসূরিত্ব যেন হরিশ্চন্দ্র মিত্রের কাজের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ।

'মনোরঞ্জিকা' (১৮৬০), 'ঢাকা-প্রকাশ' (১৮৬১) ইত্যাদি পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকায় সর্ব বিষয়ে আলোচনা থাকলেও কবিতার স্থানও ছিল বেশ প্রশস্ত ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় 'রহস্য সন্দর্ভ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে । কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি এবং ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি-র আনুকূল্যে প্রকাশিত পত্রিকাটিতে গদ্য, পদ্য, নানাবিধ আলোচনা সবই থাকত । তবু কবিতার দিক থেকে পত্রিকাটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না । এই পত্রিকায় ১৮৬৪-তে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ওড়িয়া কবিদের পরিচিতি লিখেছিলেন । প্রাদেশিকতার বেড়া ভেঙে অন্য ভারতীয় ভাষার কবিতার প্রতি মনোযোগ এখানেই প্রথম দেখা যায় । ১৮৬৫-তে মধুসূদনের দুটি সনেট—'কবতক্ষ নদ' ও 'সায়ংকাল' প্রকাশিত হয় এখানে । তখনও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়নি এবং মধুসূদন ছিলেন ফ্রান্স-প্রবাসী । কবিতা দুটির সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল সনেট সম্পর্কে একটু ভূমিকাও দিয়েছিলেন ।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অবোধবন্ধু' (মাসিক পত্র) প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে । প্রথম স্বত্বাধিকারী ছিলেন বিহারীলালের বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ । কিছুকাল পরে অবশ্য পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় ও ১৮৬৭ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয় 'প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা' রূপে । এই পত্রিকার বিভিন্ন বিষয় থাকলেও কবিতারই প্রাধান্য ছিল । ১৮৬৭-র ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম

সংখ্যার প্রথমেই ছিল একটি ছয় পঙক্তির বাংলা কবিতা—

স্বদেশের যে প্রকারে হোতে পারে হিত
সাধ্যমতো চেষ্টা করা সবার উচিত ।
তিলসম হেন কাজ যদি মনে লয়,
তথাচ নিরস্ত থাকা যুক্তিযুক্ত নয় ;
কি জানি সহস্র মাঝে যদি কোন জন
সামান্য সে ক্ষুদ্র কাজে উপকৃত হন ।

১৮৬৭ সাল স্বাদেশিকতা বোধের উন্মেষের যুগ, 'হিন্দু মেলা'র যুগ । সেই দেশপ্রীতির সুর লেগেছিল 'অবোধবন্ধু'-র অনেক কবিতায় । সমকালের দেশ ও সমাজের আলোড়নে সাড়া দিতে সাময়িক পত্র সবসময়েই তৎপর থাকে । অবোধ-বন্ধু'-তে প্রকাশিত হয়েছিল কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক কবিতা । তাছাড়া বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী', 'সুরবালা', 'নিসর্গ সন্দর্শন' সবই প্রকাশ পায় এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় । এই সব কাব্য ও কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনাকে উদ্বেলিত করেছিল তা তিনি লিখে গেছেন অকুণ্ঠ-ভাবে একটি প্রবন্ধে (সাধনা, আষাঢ় ১৩০১) । বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-কে তিনি বলেছেন প্রভাতসূর্য আর 'অবোধবন্ধু'-কে বলেছেন ঊষাকালের শুকতারা । 'অবোধবন্ধু'-তে বিহারীলালের কবিতা সম্পর্কে তাঁর আরো মন্তব্য—"এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম । তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল । তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত ।" (জীবনস্মৃতি)

১৮৬৩ সালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক পত্র 'বামাবোধিনী'—যার সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত আর পরিকল্পনা ও পরিচালনার প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন । 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠাতেও কবিতা লিখতেন মেয়েরা কিন্তু নাম না থাকায় তাঁদের চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না । মেয়েদের কবিতার সংখ্যাও কম ছিল তা বলা বাহুল্য । 'বামাবোধিনী'-তেও কবিতার সঙ্গে লেখকের নাম দেওয়া থাকত না অনেক সময়ে ; তবু মহিলাদের রচিত বলে জ্ঞাত থাকায় বাঙালি মেয়েদের কবিতা-চর্চার উৎসাহ এই সময়ে বৃদ্ধি পায় । 'বামাবোধিনী'-র প্রতি সংখ্যায় শিরোভূষণ রূপে নতুন নতুন কবিতা থাকত । নমুনা হিসেবে দ্বিতীয় সংখ্যার কবিতার প্রথম দু'লাইন উদ্ধৃত হল—

সকলের পিতা যিনি করুণানিধান।
নরনারী প্রতি তাঁর করুণা সমান ॥

ক্রমে মেয়েদের জন্য, বালক বালিকাদের জন্য পত্রিকা প্রকাশের দিকে মনোযোগ দেখা দিতে লাগিল। ১৮৬৯-এর 'অবলা-বান্ধব' মহিলাদের জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল। কবিতা প্রকাশিত হত কিন্তু কবিতাই প্রধান উদ্দিষ্ট ছিল না।

১৮৭০ সালের 'সুলভ সমাচার' (প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১২৭৭)-ও কবিতা-প্রধান সাময়িক পত্র হিসেবে পরিকল্পিত হয়নি। তবু কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত এই পত্রিকাটির নাম করতেই হয়। প্রতি বছর একজন করে নতুন সম্পাদক হতেন এই পত্রিকার। যদিও কেশবচন্দ্রই ছিলেন মূল পরিচালক। এক পয়সা দামের সাপ্তাহিকীটি তার সুলভ মূল্যের জন্যও স্মরণীয়। সাহিত্যকে সকলের হাতে পৌঁছে দেবার এই প্রয়াস বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে আমরা পরে দেখেছি যখন তিনি ১৯৪২-এ 'এক পয়সায় একটি' নামে চার আনা দামের ষোলো পৃষ্ঠার কবিতা পুস্তিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। 'সুলভ সমাচার'-এ সংবাদ নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য, গল্প, কবিতা সবই থাকত। এই পত্রিকাই প্রথম শারদীয় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে শুরু করে রম্যরচনা ও গল্প কবিতা সাজিয়ে। আজ 'শারদীয় সাহিত্য' অভিধায় বিপুল যে কর্মকাণ্ড আমরা প্রতি বছর প্রত্যক্ষ করি তার আরম্ভ 'সুলভ সমাচার'-এ। এই পত্রিকার শিরঃকবিতাটি উদ্ধৃত হল—

ধনমান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে ওঠা দায়।
জ্ঞানধর্ম চাও যদি অবারিত দ্বার ;
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

যাঁরা বলেন বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে প্রথম যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ সাময়িক পত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' তাঁরা এক অর্থে ভুল বলেন না। তবু বলতেই হবে যে, বাংলা কবিতা প্রথম যুগে নিজস্ব রূপ-সৌন্দর্য ও চারিত্র্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পেরেছিল 'বঙ্গদর্শন' (এপ্রিল, ১৮৭২) প্রকাশ পাবার আগেই। 'বঙ্গদর্শন' তেমন কোনো কবিকে কিন্তু সৃষ্টি করেনি। 'বঙ্গদর্শন' অবশ্যই ছিল সাহিত্যমনস্ক। তার আগে সাময়িক পত্রের চরিত্র ছিল প্রধানত পাঁচমিশেলি। হরেকরকম আলোচনা, সাহিত্য ও সংবাদ—সবই থাকত। 'বঙ্গদর্শন'-এ থাকত কেবলই সাহিত্য ও বঙ্গভাবনা সম্পর্কিত প্রবন্ধ। এখানেই প্রথম নিয়মিত সাহিত্য

আলোচনার সূত্রে একটি সাহিত্যরুচি গড়ে দেবার চেষ্টা হয় ; সাহিত্যতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা হয়। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রধান মূল্য পেত প্রবন্ধ আর উপন্যাস। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ছিল উপন্যাসের কলম। বস্তুত বলা যেতে পারে—'বঙ্গদর্শন'-এর পর থেকেই 'বঙ্গদর্শন'-এর ধারা অনুসরণেই অচিরে সাময়িক পত্রের অবিচ্ছেদ্য উপাদান হয়ে উঠল ধারাবাহিক উপন্যাস এবং নভেলেট আকারের বড় গল্প। সাময়িক পত্রে কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল গল্প-উপন্যাস। কথা সাহিত্যের আকর্ষণ ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল বলেই একটা সময় এল যখন কবিতা-প্রকাশের ব্যাপারে পত্রিকা সম্পাদক কিছু কম গুরুত্ব দিতে লাগলেন। পত্রিকার পৃষ্ঠায় কবিতার মুদ্রণ খুব দৃষ্টিনন্দনভাবে করা হত না। গল্প-উপন্যাস বা প্রবন্ধের নিচের ফাঁকা অংশে এবং একটি পৃষ্ঠায় যথাযোগ্য স্পেস না দিয়ে কবিতা ঠেসে দেওয়া হত। এই রীতিরই পরিবর্তন চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তারই ফলে 'কবিতা' পত্রিকার উৎস-প্রেরণা জেগেছিল তাঁর মনে। অবশ্য 'কবিতা'-র আগেই 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা', 'পরিচয়' 'পূর্বাশা'য় কবিতা মুদ্রিত হত খুবই সুন্দরভাবে, পূর্ণ মর্যাদায়। কবিতার জন্য নির্দিষ্ট থাকত বিশেষ স্থান। তবু সেসব পত্রিকায় কবিতা ছাড়াও থাকত অন্যান্য বিষয়। 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতি', 'উত্তরা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী', 'মর্মবাণী' ও 'নব্য ভারত' ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা যথেষ্টই স্থান পেত কিন্তু প্রধান আকর্ষণ ছিল গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া অন্যান্য কবিদের রচনা যে-কোনো ফাঁকা জায়গায় গুঁজে দেওয়া হত—একথাও সত্য।

'বঙ্গদর্শন'-এ অবশ্য কবিতার আলোচনা করা হত খুবই গভীর ও ব্যাপক-ভাবে। সেই সময়ে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগুলি আলোচিত হয়েছে ; এক একজন কবিকে নিয়েও আলোচনা হয়েছে কখনও কখনও। সবচেয়ে বড় কথা, সাহিত্যতত্ত্ব, কবিতার ভাষা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয় 'বঙ্গদর্শন'-এ।

কাজেই আমরা বলতে পারি 'বঙ্গদর্শন' থেকে বাংলা সাময়িক পত্রিকার একটি ধারার অবসান ও পরবর্তী একটি ধারার সূচনা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে আমরা লক্ষ করি সংবাদপ্রধান পত্রিকায় কিভাবে নিজের জমি অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে জয় করে নিচ্ছে কবিতা। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখতে পাই কবিতা জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে কথাসাহিত্যকে। কোথাও কোথাও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে প্রবন্ধ। এই ধারার পরিবর্তনের সূচনা আবার হয়েছিল পঞ্চান্ন বছর পরে

বুদ্ধদেব বসুর হাতে ঢাকা থেকে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রিকা থেকে। যদিও 'প্রগতি'-তে সাহিত্য বিষয়ক সব ধরনের লেখাই থাকত, তবু সম্পাদকের আগ্রহ কবিতার খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল বলে স্পষ্টই অনুভূত হয়। স্বল্পস্থায়ী 'প্রগতি'-র পর 'পূর্বাশা' (১৯৩২) পত্রিকায় সঞ্জয় ভট্টাচার্যও কবিতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বিশেষ করে। ১৯৩৫ সালের 'কবিতা' পত্রিকা এই পরিবর্তনের ধারাকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিল। নতুন করে বাংলা সাময়িক পত্রে কবিতা ভূষিত হল সর্বোত্তম মর্যাদায়। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলেছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

থা কা মা নে

থাকা মানে কিছু বই, থাকা মানে লেখার টেবিল।
থাকা মানে আকাশের নীল,
পুকুরের জলে রোদ, গাছের সবুজ,
বুকের ভিতরে কিছু চোরা টান, সায়ংকালীন
স্তব্ধতার মধ্যে ধীরে-ধীরে
নৌকাটির দূর থেকে ক্রমে আরও দূরে চলে যাওয়া।

থাকা মানে ভাদ্রের গুমট ভেঙে ছুটে আসা হাওয়া,
যা এসে বুকের মধ্যে লাগে।
থাকা মানে মানুষের মুখ, ঘাম, ক্লান্তি ও বিষাদ,
যা নিয়ে সংসার, তার সবই।
থাকা মানে দুঃখে-সুখে সংরাগে-বিরাগে
সবকিছুকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখা।

থাকা মানে আলোতে-কালোতে আঁকা ছবি,
থাকা মানে তারই মধ্যে বেঁচেবর্তে থাকা।

শঙ্খ ঘোষ

এ সে ছ প্রে ম এ সে ছ আ জ

চিরায়ত বর্তমান, আহা মরে যাই মুখ দেখে !
জারিজুরি জানি খুব—এতদিন কোথায় ছিলেন ?
সর্বস্ব খেয়েছ তুমি, আমার কতটা জানো ?   পাজি ।
আজই যদি ডাক আসে এখনই তো উড়ে যেতে রাজি ?
বিকেলে ছড়ানো মাঠে ফসলশিয়রে টলে আলো
যে মেয়েটি ফিরে গেছে তারও কিছু সুষমা ঝরাল—
কার তাতে আসে যায় ! তোমার তো আদিগন্ত জ্বালা ।
কিছু কি শুনতে পাও ওহে মহাশয় ?   আমি তাই
নিজেকেই কামড়ে খাই, আর-কিছু বুঝি না কী-করা—
অর্ধেক পাষণ্ড তুমি, অর্ধেক আতর দিয়ে গড়া !

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মা নু ষ বা গা ন

বাগানে তো কতো ফুল, তার মধ্যে প্রিয় কৃষ্ণচূড়া ।
দুরকম ফুল আছে—একটি হলুদ, অন্য লাল,
দূরদেশি রাখাল ছেলে নিয়ে আসে সন্তুষ্ট সকাল,
বাগানে তো কতো ফুল, তার মধ্যে প্রিয় কৃষ্ণচূড়া ।

বর্ষায় ফোটে এ-ফুল, অন্যকালে পাতা জেগে থাকে ।
সবুজ পাতাও হয় হলুদ এবং ঝরে যায়,
ফুলগুলি ঝরে যায় সময়ের গূঢ় আবর্তনে--
মানুষ বাগান থাকে পাশাপাশি, এবং থাকে না ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নির্মাণ খেলা : দুই

রতিকৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রমা দোলে
জলে ভেসে আছে খানিক আকাশ খানিক মেঘের ছেঁড়া অবকাশ
রাত্রিবসনা এ কেমন নারী দেবতাকে দেয় নীল তরবারি
বুক পেতে দেয় উরু ঝলসায় মায়া সিন্দুক খোলে···

এই চারলাইন লেখার পর আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। প্রায় মধ্যরাতে দোতলার জানলা থেকে পুকুরের জলে চাঁদের দোল খাওয়া দেখে কবিতার প্রথম লাইনটি মনে আসে। চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর যাবতীয় জলের যৌন সম্পর্ক। প্রথম লাইনটি সে জন্য স্বাভাবিক। দ্বিতীয় লাইনটিতে অনেক দ্বিধার কাটাকুটি আছে। প্রথমে লিখেছিলাম, 'জলে ঢেউ ওঠে, জলে বিভঙ্গ আকাশের এক কণা'···। তেমন পছন্দ হলো না। ছন্দের চালটা বদলালে মন্দ কী? দ্বিতীয়বার লেখার পর 'ছেঁড়া অবকাশ' নিয়ে একটু খটকা লেগেছিল, তারপর ভাবলাম, চলুক না!

তৃতীয় লাইনে নীল তরবারির বদলে প্রথমে লিখলাম 'মায়া তরবারি', এটা খুব সহজে প্রথা বাহিত ভাবে আসে। প্রথার ভূত মাথা থেকে তাড়ানো খুব শক্ত। কিন্তু চতুর্থ লাইনে 'মায়া' শব্দটা আমার আবার দরকার। মায়া তরবারির চেয়ে মায়া সিন্দুক অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, তখনই দেখতে পাই নীল তরবারি।

চাঁদ যখন দেবতা ছিল, তখন যৌন টানের নামই ছিল প্রেম। দেবতারা আসলে প্রেম জানে না। নীল আর্মস্ট্রং-এর পায়ের ধুলো পড়ার পর চাঁদ আর দেবতা নেই। তাছাড়া, এই চার লাইনের মধ্যে আমি কোথায়? কাটাকুটি করে লাইনগুলি এই ভাবে রূপান্তরিত হয় :

এত শব্দ কেন, দিগন্তে কেন আগুন?
বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে নেমে গড়িয়ে যায় রক্ত
বাবা হঠাৎ হঠাৎ আমার কান ধরে টানে?
নদীর জলে লুটোপুটি খাচ্ছে চাঁদ, এ যেন বিশ্ব বিশ্রুত প্রেম
নিঃশব্দ নিশীথে দোলে হাওয়া
ওরা কিছুই জানে না

বারান্দায় একা বসে সমস্ত শরীর ও শ্বাস উষ্ণ হয়ে ওঠে
সাঙ্ঘাতিক ইচ্ছে করে নদীতে উন্মুক্ত হয়ে নেমে পড়তে
কিন্তু তাকে স্পর্শ করার আগে বারবার প্রশ্ন করি, আমাকে
ভালোবাসবে নদী?

[এতে ছন্দ নেই, এত গদ্যময় হয়ে গেল রাত। আর লিখতে ইচ্ছে করে না। কলম সরিয়ে রেখে বারবার মনে মনে আওড়াই : রতিকৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রমা দোলে। রতি কৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রমা···]

প্রিয় প্রণবেন্দু,

সুবীর মারা যাওয়ার পর থেকে মনটা নরম হয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত ওই তো বাথরুমের দরোজার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা। পেছনের তাকে কতকগুলো মরা বই। ঘটি-বাটি নিয়ে অর্থহীন কাড়াকাড়ি। সন্দীপন লিখেছে, 'হাতির নাদের ওপর থেকে যে ধোঁয়া ওঠে, তাই সফলতা।' এ বছর পুজোয় অনেক লেখক অপমানিত হয়েছে পত্রিকাওলাদের হাতে। টাকাও পেয়েছে। টাকা আর অপমানের বিনিময়ে তারা থুতু ছিটিয়ে দিল। ওই থুতুগুলো জড়ো করে এবার বই হবে। কী করা!

একটা কবিতা পাঠাচ্ছি অলিন্দের জন্যে। প্রথম পাতায় না হয় না হলো, যেখানে খুশি ছাপাবেন। শুভেচ্ছা, ইতি

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

তা কি য়ে থা কি

কোথাও কেউ কথা কয় না, কাজ কেবল কাজ,
ধাক্কা মারে ব্রিফকেসের চৌকো আর স্টেনলেসের শাদা,
তাই
রাতে আমার ঘুম হয় না, শান্তি নেই মনে।

ভোরের দিকে সাধুর কাছে আসি ;
শ্বেতপাথর কী মসৃণ, ফর্সা হাসিমুখ,
চুপটি করে তাকিয়ে থাকি, গন্ধ পাই
পচা ফুলের গন্ধ আর লোকজনের নীরব চলাফেরা।

সাধু বলেন, শরীর মানে কষ্ট আর অশান্ত এ-মন,
আত্মা হলো নির্বিকার, পরম যিনি একান্ত আশ্রয়,
আসক্তিহীন কর্ম করে যাও।
সাধু বলেন, স্বপন, তুমি দশ হাজার দাও
মন্দিরের লাগোয়া এক অতিথশালা হবে।
পিঁপড়ে-মারা চিনির থলে উজাড় করে দিয়ে
হালকা হয় মানুষ, তার বুকে বাতাস লাগে।

আমি কিছুই দিই না, শুধু তাকিয়ে থাকি, ভয়
নিঃস্ব হয়ে গেলে
আত্মা যদি চেঁচায়, যদি কষ্ট পায় শরীর
পরম যদি কোল না দেন, কোথায় গিয়ে শোবো!
কারুর ওপর আস্থা নেই
তাই বোধ হয়
আমার মনে শান্তি নেই কোনো।

নবনীতা দেব সেন

দা ম

বন্ধু বড়ো ব্যস্ত লোক ছিলো।
ইদানিং বন্ধু বড়ো ব্যস্ত লোক হয়ে পড়েছিলো
মীটিঙে মীটিঙে তার অন্তর বাহির
ছিন্নভিন্ন করে ফেলে নিদারুণ ব্যস্ততা কিনেছিলো।

বোঝাতে পারিনি, কর্মবীর না হয়েও
ধর্মে ধীর থাকাটা সম্ভব।
বোঝাতে পারিনি
'মীটিঙে' যে 'সঙ্গ' নেই, শুধু 'দল' আছে
যেখানে 'মনুষ্য' নেই 'সদস্য' কেবল,
বোঝাতে পারিনি তাকে, মানুষের ব্যক্তিগত দামে
দৈনন্দিন ব্যস্ততায় নয়।
প্রিয়জনদের কাছে, সে যে আছে,
সেটাই যথেষ্ট দামী—

এখন যেমন,
সে যে ছিলো—
শুধু সেটুকুও॥

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

র য়ে গে ল স ম্ভা ষ ণ

যদি বলে যেতে নাই পারি
এইখানে খুঁজে দেখো
হয়ত বা রয়ে গেল সম্ভাষণ
বিদায়ের, প্রণয়েরও

প্রোমোটর ভেঙে গেছে উত্তীর্ণকালের বাড়ি
বহুতল বস্তি হবে দিনকয় পরে,
আজ এক নিভৃত বকুল পাহারায় রয়ে গেছে
চূর্ণ ইঁট পাথরের পরে
শ্রাবণের জ্যোৎস্না এসে কুটবুদ্ধিহীন শিশুর মতন
ছায়া আর আলো নিয়ে খেলা করে

এখানে উচ্ছন্ন ভাঙাচোরা যা কিছু রয়েছে
তারই মধ্যে খুঁজে দেখো
যদি পাও শিলালেখ কোনো, অনুচ্চ ভাষণে বলে
'এ শহরে গাছ ছিল মরশুমি ফুলও
পাখিদের ওড়াউড়ি আছে আজও
মানুষ জন্মের যত ভালোবাসাবাসি তাও আছে
প্রনষ্ট ভাঙনে আজও
অবিনাশ উদ্ভিদ হয়ে ছটফট করে সে প্রণয়—'
খুঁজে দেখবে না?

যদি বলে যেতে নাই পারি
এইখানে হয়ত বা রয়ে গেল সম্ভাষণ
বিদায়ের, প্রণয়েরও।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

এ ক দি ন

রাজকন্যার মত সার্কাসও কিছু কম পড়েছে এবার। গ্রেট সাহারানপুর অবশ্য এসেছিল। তবে উঁচু হতে দলের যে ট্রাপিজ সুন্দরী মিমো যোগুলেকর পেঁছে গেছে চিত্রহার, সে আর এসে উঠতে পারেনি। শুনেছি, তার বরাতের সড়ক খুলেছে বরাবর হংকং-তক, যেখানে সে জেনেট-কেও শিহরিত থাই আর সাহারানপুরী লচক দেখাচ্ছে। মিমো আমাকে এমন তুক্ করেছিল যে, পাশের বাড়ির ডিশ্ অ্যান্টেনার ভরসায় একটু ফুরসৎ পেলেই আমি স্টার টেলিসেন্টার খুলে তক্কে তক্কে থাকি যদি তাকে পেয়ে যাই। শনি-রবি তো ঘর ছেড়ে বেরোই না। এভাবে আমার দাড়ি আকামানো থাকে নখ বেড়ে যায় আর মিমো উঁচু হতে হতে ট্রাপিজের লাউডগা মাড়িয়ে চিত্রহারের সড়ক বেয়ে সোজা চলে যায় হংকং।

আমার ফুসকুড়ি আর আহাম্মুকির গোটাগুলো এখন শাদা সর্ষে। পুটু করে গেলে দিলে কষালো পুঁজ গড়ায়। বেমালুম ভুলে যাই আমার দুটো ছটফটে পা আর দুই উরুর অশ্বিনীযুগলকে। মিথ্যে শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে টিকটিকির লেজের মত আমার জিভ একদিন টুপ্ করে খশে যায় চোখ গালের ওপর ঝুলে পড়ে। ঘরের জানলা-ঢাকা পর্দা বাতাস খায় আর কুলকুচো করে বাইরে ফেলে দেয়। একদিকে মানুষের মত বেঁটে আর ট্রামলাইনের মত লম্বা হতে হতে মাঝবরাবর ছিঁড়ে যাই। আমার হাফহাতা শার্টে পায়জামা আর চটিজোড়া অপেক্ষা করতে করতে করতে করতে একদিন মেঝের ওপর শরীর বিছিয়ে শান্ত শুয়ে পড়ে।

তারাপদ রায়

এ খ নো পা রে

এই কবিতাই অন্যরকম হতে পারে।

একটু জল হাওয়া আদর যত্ন পেলে
এই অবেলায় অলসলতার শিষে,
দুয়েকটি সাদা ফুল ফুটে উঠবে।

বিকেলের আবছা আলোয়
দুয়েকটি সাদা ফুল ;
খুব কাছাকাছি গেলে
হয়তো ক্ষীণ সৌরভ পাওয়া যাবে,
আরেক জীবনের অমল ভালোবাসার
দুয়েকটি অন্যরকম সাদা ফুল
একটি কলস লতার শিষে।

এই কবিতাই অন্যরকম হতে পারে।

এখনো পারে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ঘুমের আগে

পাশের কোনো বাড়িতে টেলিফোন বাজছে। একটানা।
ঘড়িতে রাত দুটো গুঞ্জন করে উঠলো জানলার আকাশ থেকে
পুনর্বসু আমাকে এসময় দ্যাখো

একটা কবিতার পাশে বসে আমি। তাকে সোহাগ করি।
দীর্ঘ তিরিশবছর এই একটাকেই রপ্ত করে কেটে গেল।
এতবার লিখলাম
মুছলাম
লিখলাম
তবু কিছুতেই যেন ঠিক দাঁড়াচ্ছে না।
কি বলতে চাই জানি, কিন্তু কেমন করে বলবো
ভেবে অকূল দরিয়ায়! যেন স্বকালপাঠক আমার শব্দগুলি
নিজের বলে চিনতে পারে এমন শব্দ আসুক
তারা হাসুক, কাঁদুক শিশু হয়ে শোনাক দেয়ালা
—বাঞ্ছা ছিল এই।
অক্ষরের মধ্যে আগুন ভরে দিতে গিয়ে দেখি
শ্মশানের অগ্নীশ্বর চিতায় আমার কালো হয়ে ওঠা
বর্ণমালাগুলি পুড়ছে। কে তাদের বন্ধনযাত্রায় পাঠালো;

টেলিফোনটা এখনো কান খুঁজে পায়নি।
কেউ কথা শোনাবে, কেউ কিছুতেই শুনবে না, তাই এই অনর্গল
বেজে যাওয়া। আমার টেবিলে বিছানো সাদা নিয়তির কাছে
শব্দরা আসছে না, আমি তবু তাদের ধরে বেঁধে
আলিঙ্গনে আনতে চাইছি···

একটা পাখির সঙ্গে রোজ ভোরে দেখা হয়। একটা পাখি?
নাকি একইরকম পাখি। রাস্তার ওপারেই একটা

পদ্মবসতি ঝিল,
ওপার জল থেকে একটা ঢেউ বাতাসকে সঙ্গে নিয়ে
এই নিরাকার আঁধারেও এপারে আসছে নিশ্চিত!
কাল ভোরে সূর্যভাঙা মেঘ হয়ে উঠবে
অকবিরও অনুকরণীয়। অথচ ঠিক তখনই
অনিদ্র রাতবাতি নিভিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়বো।

প্রকৃতির নিজস্ব শিল্পের কাছে পরাজিত একজন
এভাবেই চলে যাবে চেতনার শেষ পারাবারে···

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ ক চে টে গাঁ দা র অ প ঘা ত

সিঁড়ির কোণ দিয়ে রুয়ে রাখো নয়নতারা গাঁদা ফুল। চ্যালা জটঘাস
ঠেলে আসছে দোরমুখে। দিগ্‌বিদিক অন্ন খুঁজতে ঘুরছ ভরদিন
কত খোপ কামরা দুনিয়া, কত রোদ্দুর ধুমে হয়ে পুড়ছে, থেকে থেকে
কত ঝড় বর্ষা ধস—কুঁচকে সিঁটিয়ে গেল নাকি খাঁচাখানা ?
বুকটুকু ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া উঠছে খালি। কটা বাজল ? রোজ রোজ
এক কথা বলো কেন ? আরো জোরে বাজবে বলে ? বন্ধ হয়ে যাবে ? দোর-দোর
কান ঘষে শুনছ বুঝি ভেতরের রাতের আওয়াজ ! কটা বাজল ? শেষ গাড়ি
ছেড়ে দেবে বলে ছুটছ—আগটাতে একদণ্ড বসে তাপ নাও। উরত ডুবিয়ে
ঘরে ফিরে দেখ ঘর কেরোসিন ডিবেয় লাল হয়ে আছে—সর্বাঙ্গের
উই চ্যালা আগাছা সবগুদ্ধ মন-মন যেন তোমারই অসুখ
কাঁদছে সে—কানা বোবা ঘর তার একচেটে গাঁদার অপঘাতে।

শান্তিকুমার ঘোষ

ম নো হ র হ য়ে উ ঠ ছে

ভূমধ্যসাগর বায়ু অনবরত সিঞ্চন করছে
দক্ষিণের এই দিক-দেশকে
চেখের উপর নেচে গেল অভিরাম ভূপ্রকৃতি
পরমাত্মীয়ের মতো যারা এসেছিল
স'রে যাচ্ছে আমার জীবন থেকে
কিন্তু মনোহর হ'য়ে উঠছে সন্ধ্যা ও প্রভাত
সবুজ হ'ল হ্রদের স্বচ্ছ জল
লিলি-শুদ্ধ লিলির মধ্য দিয়ে লঘু ভেসে যায় রাজহংস
ধীর গর্বিত ছন্দোময় ভঙ্গীতে
এধারে কাঠের বাঁকা সাঁকো
শিলাখণ্ডগুলি ওপাশে তরুমূলে
জলের কিনারে
সূর্যরশ্মি এসে ছুঁয়েছে নৌচালকের ললাট
হয়তো পড়বে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি
আমার অবনত শিরে

মু ঠি খু লে ভে সে গে ল

পাহাড়ের মাথায় সবুজ পল্লব তুলে ধরেছে
কালো পাথরের মেয়ে
প্রান্ত ছুঁয়ে ব'য়ে যাচ্ছে গেরুয়া স্রোতের ড্যানিয়ুব
আমি কোনো দাবী নিয়ে আসিনি
আমার নেই অভিমান
মেঘলা বিকেলে দূরের দ্বীপকে দুটি ধারা যেন
ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে

নীল বাষ্প আর বৃষ্টি বিন্দু ঢেকে ফেললো একের পর এক
ঝুলন্ত সাঁকো
ভালোবাসা কুসুমের মতো মুঠি খুলে ভেসে গেল জলে
আমার মস্তিষ্কের ভেতর ফুঁসে উঠছে জলস্রোত—
গর্জে ছুটেছে লক্ষ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন
বিফলতা ছাড়িয়ে ওই জেগে রয়েছে শৌর্যবান চূড়া

হা ও য়া ই দ্বী পে পে য়ে গে ছ

হাওয়াই দ্বীপে পেয়ে গেছ কাপ্রির তুলনা
বসন্তের সব ফুল গ্রীষ্মের ফলরাজি ফলিয়াছে গুচ্ছ
পাহাড় বলছে, 'দ্যাখো, ফুলসাজে জেগে আমি বঙ্কিমা-ঋজু'
সমুদ্র দিয়েছে ডাক, 'নীলাম্বরী ফেলে, এসো হৃদয়ে আমার'
পাহাড়ের গুমোর ভারি দেবতা রাখেন পা অমল শিখরে
হুঁসিয়ারি হানে সিন্ধু, 'আঁকড়ে ধরেছ বৃথা শেষ তটভূমি'
গঙ্গাযমুনার শোভা ঘনিয়েছে বুকে আজ কার জন্মতিথি
সমুদ্র তুললো ঝড় টাইফুন-টর্নাডো বেগ ক্রোধ ক্ষমাহীন
পাহাড় পেতেছে বুক শৌর্যের পরীক্ষা তার হ'ল বারংবার
সমুদ্র-পাহাড় মিলে হৃদয়ের অধিবাস চিরদ্বীপবাসী

বটকৃষ্ণ দে
ব ন্দী টি য়া

কিছু একটা করছি, কিছু একটা হচ্ছি অথবা
কিছু একটা করব, কিংবা কিছু একটা হবো
এই ধরণের কতগুলো অসংলগ্ন অর্থহীন
মন ভোলানো মধ্যবিত্ত ভাবনা ভেবে-ভেবে
নীলকালো চশমার মধ্য দিয়ে অবাস্তব অলীক রঙীন স্বপ্ন দেখে দেখে
আর
খাপছাড়া ছন্নছাড়া জোড়াতালি দেওয়া জীবনের জটগুলি ছাড়াতে ছাড়াতে
হঠাৎই আবিষ্কার করলাম—
রাত অনেকটাই কাবার হয়ে গেছে নক্ষত্রেরা নির্জন নিষ্প্রভ হয়েছে
বহুকাল অতন্দ্র থাকার পর সেই যে ভেবেছিলাম
একটু ঘুমোবো, সেই ঘুম এলো-ও না, আর আসবে না !
কতবার ভেবেওছিলাম,
ওই সব অপদার্থ বোকা-বোকা ঝোলাওয়ালা
লোকগুলোর ধারে কাছে একদমই যাবো না
(হায় রাম ওদের চিনলে না ?)
যাবো না যাবো না করে শেষে কিন্তু সে নিষিদ্ধ পথেই পা দিলাম
নাম লেখালাম সেই ভয়ংকর দলে
যার থেকে ছাড়া পেতে গোটা একটা জীবনই চলে যায়
কন্যাকুমারীর তিন সমুদ্রের মোহানায় ঝরা সূর্যাস্তের
মুগ্ধ সৌন্দর্যের রহস্যময়তার নীলাভ নেশায়
অতি মূর্খ একটা লোক আরো বহু মূর্খের মতোই
অকারণ স্বপ্ন দেখা পাগলামিতে
অথবা করবো, বা হবোর মধ্যবিত্ত ভাবনাতে
কিছু একটা করছি, কিছু একটা হচ্ছি
বন্দী টিয়া অবুঝ কৃষ্ণ কথা কয়ে গেলো,
সারাটা জীবন !

একরকম নয়, অনেকরকম কবিতা

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আগে ঠিক করে নেওয়া যাক, কবিতা কি একটা বদ্ধ জলাশয়ের মত, কিংবা একটা গণ্ডি-কাটা কুয়োর মত, যার মধ্যে কোনও স্রোত নেই, চলমানতা নেই, স্পন্দন নেই? কবিতা কি গতিস্তব্ধ হয়ে থেমে যাবে কোথাও, আর এটাই কি প্রত্যাশিত? সব কবিই কি একটা ধারা মান্য করেই জ্ঞাপন করবেন তাঁর উচ্চারণ, প্রাক্তন ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করেও কি তিনি গড়ে তুলবেন না নতুন কোনও ঐতিহ্যের সম্ভাবনা? আর তাঁর পাঠক কি অনুদার মনোভঙ্গির আশ্রয়ে উপেক্ষা করবেন তাঁর নতুন রীতিকে, অগ্রাহ্যতা পেশ করবেন তাঁর সাম্প্রত ঘরানাকে ঘিরে? প্রশ্নগুচ্ছের মধ্যেই উত্তর প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথা যদি কেউ মনে করে থাকেন, তবে তো সিদ্ধান্তটা আগাম গ্রহণযোগ্যতা পেয়েই গেল। এবং তাহলে মুক্তমনে ও নির্ভয়ে প্রথমেই বলে ফেলা যাক, কবিতা একরকমের নয়, অনেকরকম। সময়ের দ্রুতির সঙ্গে তাল রেখে আর কবিতাশিক্ষার প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে নানারকম কবিতার মুখোমুখি দাঁড়াব, তার বিভিন্ন খাতের রেওয়াজে ঋদ্ধ করে তুলব নিজেদের, এ সত্যটা পাঠক হিসেবে যতটা দরাজভাবে এবং অকৃপণতায় আমরা গ্রহণ করে নিতে পারি, ততই সুলক্ষণ।

একটু সংশয়ের বশবর্তী না হয়ে পারি না যখন দেখি কবিতায় নিবেদিত একজন শিক্ষিত মানুষ এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসে স্থিত হতে চাইছেন যে কবিতা একই ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলুক, তার বৈচিত্র্য হোক অস্বীকৃত, একই গোত্রের ভাষা-মাধ্যমে বিন্যস্ত হোক তার নির্মাণ, একটা ঐতিহ্যেই আশ্রয় নিক তার যাবতীয় সম্পন্নতা, আশপাশের নানারকম উচ্চারণ রীতির ভিন্নতাকে সে করুক অনাদর। কবিতা নিয়ে এতগুলো দশক হেঁটে আসার পর তাহলে কি এই বিশ্বাসটাই আজ আঁকড়ে থাকব আমরা? আর তাহলেই আমাদের অনায়াস স্বস্তি আসবে, অনেক আরামদায়ক আত্মতুষ্টি জাগবে আমাদের চর্চায়? আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ কি এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে যখন চল্লিশের একজন প্রতিভূ কবি তাৎক্ষণিক উত্তর দিয়েছিলেন, 'আধুনিকতর কবিতার কাছে পরাস্ত হওয়া,' সে উত্তরের মধ্যে ছিল একটা মুক্তমন ঔদার্য, বাঞ্ছিত বদান্যতা। আর এই আধুনিকতর হয়ে ওঠার মধ্যেই তো ছিল আরেক ঐতিহ্যের বীজ, চলমানতার প্রচ্ছন্ন সংকেত।

'আরেক ঐতিহ্যের বীজ' কথাটার ওপর আমি জোর দিতে চাইছি একটু

বেশি। তার মানে বহিরঙ্গ দৃষ্টিপাতে দ্বিতীয় কি তৃতীয় কোনও ঐতিহ্যের সম্ভাবনাকেও আমরা অভ্যর্থনা জানাতে কুণ্ঠিত হব না, এ সত্যটাকেই আঁকড়ে থাকা বাঞ্ছিত বলে মনে করছি। আপাত প্রত্যক্ষণে কবিতার নিশ্চয়ই একটা সর্বজনমান্য ঐতিহ্য আছে, আর সে ঐতিহ্য তিলে তিলে গড়ে উঠেছে বাংলা কবিতাকেও ঘিরে, তার ক্রমপরম্পরা আশ্রয় করে, কিন্তু একই সঙ্গে একেকজন কবির ঘরাণার ভিন্নতাকে কি আমরা অস্বীকার করতে চাইব, অসম্মান জানাব দু-জন ভিন্ন কবি যদি দু-রকম পদ্ধতির নির্ভরতায় মুদ্রিত রাখতে চান তাঁদের কবিতাগত উচ্চারণ? হতে পারে সে দু-গোত্রের নির্মাণ-বিন্যাসের মধ্যে আমেরু ব্যবধান, হতে পারে তীব্র বিভাজনরেখার ওপর দাঁড়িয়েই তাঁরা গড়ে তুলতে চাইছেন নিজস্ব বাক্-প্যাটার্ন, হতে পারে পাশ্চাত্যের আদলে কেউ হয়ত শুদ্ধ করতে চাইছেন এদেশীয় কবিতার শরীর, আবার দেশজ ঐতিহ্যকে অন্য মাত্রায় পরিবেশন করে কেউ হয়ত প্রয়াসী হতে চাইছেন নতুন এক ঘরাণার প্রতিষ্ঠায়। তা এইসবই তো ঘটনা হিসেবে, বিভিন্ন মেজাজী কবিতাকৃতি হিসেবে, কবিতাকে সমৃদ্ধ করে তোলবার নানা চারিত্রিক উপকরণ হিসেবেই মেনে নিতে হবে আমাদের, এবং সে মান্যতায় থাকবে একটা খোলামনের প্রতিশ্রুতি, বৈচিত্র্যকে সমাদর জানিয়ে গ্রাহ্যতা দেবার আস্থা, ভিন্নতাকে আপ্যায়ন করেও একই সঙ্গে পালন করতে হবে কবিতার প্রতি সেই প্রত্যাশিত দায়বদ্ধতা,—যে-সব থেকে কোনও বিচ্যুতিই আমরা সহনীয় বলে মনে করি না।

ধরা যাক, আমি একজন সৎ পাঠক, সনিষ্ঠ উন্মুখতা নিয়ে আমি তাকিয়ে থাকতে ভালবাসি কবিতা জগতের দিকে। রবীন্দ্রনাথকে দেখা হয়নি, দেখা হয়নি জীবনানন্দকেও। কিন্তু এই দু-জন অলোকসামান্য প্রতিভার কবিতাভাষা পাঠ করে এই সত্যটায় স্থিত হতে আমার কোনও বিলম্ব ঘটেনি যে প্রাক্তনের সর্বগ্রাসী মহত্বকে সম্মানিত করেও পরবর্তীজন ভেবেছিলেন কবিতার ঘরাণাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার কথা, ভেবেছিলেন কাব্যভাষায় অন্যতর উচ্চারণরীতি অনুসৃত না হলে কবিতার প্রার্থিত মুক্তি মিলবে না, কবিতাকে স্থাপন করা যাবে না অন্য জলহাওয়ার নিঃশ্বাসে। এবং রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি আমরা কুড়িয়ে নিতে পেরেছিলাম 'বনলতা সেন'-এর নতুন পাণ্ডুলিপি। বিস্ময় এসেছিল ঠিকই, কিন্তু অগ্রাহ্যতা আসেনি সেদিন। হয়ত একটু সময়ের অপেক্ষাকে মেনে নিতে হয়েছে, হয়ত একটু ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল সেদিনের পাঠককে। কিন্তু ঔদার্য থেকে সে পাঠক নতুন প্রজন্মের কবিতাকে যে বঞ্চিত করেন নি, ইতিহাস তার সাক্ষী।

রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে জীবনানন্দ। সময়ের ব্যবধান ছিল, অনিবার্যতায় সেই ব্যবধানের সংক্রামে তৈরি হয়ে উঠেছিল ভিন্নতর কবিতাভাষা, গড়ে উঠছিল অন্য ঐতিহ্যের অন্যরকম ঘরানা। কিন্তু পাঠক হিসেবে তো আমরা এও দেখেছিলাম, জীবনানন্দ যে স্বকীয় বাগ্‌বিধির প্রবর্তনা করছিলেন, লিখে চলছিলেন নতুন কবিতার ভাষায়, তারই পাশাপাশি আবার ধ্রুপদীয়ানায় বিশ্বাসী ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, তাঁরও ছিল নিজস্ব আঙ্গিক, নিজস্ব প্রাকরণিক কৌশল, ভাষা-আদল। প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছিল দু-রকম ঘরানার কবিতা, পাঠক কিন্তু পুষ্টি যোগাতে অকৃপণ হয়নি ওই দু-রকম স্রোতের কোনওটিকেই।

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে
আরেকটি পৃথিবীর দাবী
স্থির করে নিতে গেলে লাগে
সকালের আকাশের মতন বয়স (বিভিন্ন কোরাস, সাতটি তারার তিমির)

ক্লান্তি আর মৃত্যুচেতনা থেকে সেদিন এ কবিতা হাহাকার করে উঠেছিল জীবনানন্দের হাতে। দুই যুগের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি একটা বন্ধ্যা সময়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন : 'হারায়ে ফেলেছে সেই সান্দ্র বিশ্বাস। এই অনায়াস অতলান্ত ভাষায় বোধের বিকাশ তো সেদিন চেয়েছিল তাঁর পাঠকই। তাঁদের গ্রাহ্যতা ও সমর্থনই হয়ত সম্প্রসারিত করতে সহায়তা করেছিল জীবনানন্দের পরবর্তী পর্যায়ের চর্চাকে, কবিতাভাষাকে। কিন্তু ভুলব কি করে সমসময়ে নষ্ট পৃথিবীর আরেক ছবি আরেকভাবে জেগে উঠেছিল 'সংবর্ত'-এর কবির কাছে? ধ্বনিপ্রধান ছিল সেই ভাষা, সমৃদ্ধ ছিল নাট্যগুণে, আবার বেষ্টিত শব্দ প্রয়োগে হয়ত আবেগও আহত হয়েছে কখনও কখনও, বড্ড বেশি মননঋদ্ধ হয়ে উঠেছে তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিমা,

প্রনষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে তমিস্রার লজ্জাবস্ত্রে আজ
এসো নগ্ন মনুষ্যত্ব ঢাকি।
রক্তে কিংবা অশ্রুপাতে নিষ্কলঙ্ক হবে না সমাজ।
কেন তবে তাকে মনে রাখি?
মানবের অগ্রজেরা আমাদের মর্যাদা শেখাবে ;
ছায়া দেবে বনস্পতি ; শৈলশ্রেণী যোগাবে নির্ভর :

সভ্যতার অভিশাপে প্রস্তরিত অর্ধনারীশ্বর
স্বপ্নদুঃস্থ ক্লৈব্য থেকে অকস্মাৎ অব্যাহতি পাবে (উপসংহার, সংবর্ত)

অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, উত্তরফাল্গুনী পেরিয়ে এ কবিতা সেদিন লিখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। ভাষাগতভাবে কোনও সাযুজ্য ছিল না জীবনানন্দের সঙ্গে, ভঙ্গির দিক থেকেও ছিল পর্যাপ্ত প্রভেদ। অথচ এই বাক্‌রীতির প্রবর্তনায় নিজেকে আদ্যন্ত নিয়োজিত রাখতেই চেয়েছিলেন তিনি, এবং সুখের কথা সেদিনের পাঠকগোষ্ঠী জীবনানন্দে অভ্যস্ত থেকেও সুধীন্দ্রনাথের এই সুমিত বাক্যবিন্যাস ও যুক্তিঘন শব্দ সমবায়কে বিমুখতায় প্রত্যাখ্যান করেনি এতটুকুও। এ ছিল তাদের উদারপন্থী প্রশস্তচিত্ততার নিদর্শন। আর এই উন্নতমনা বদান্যতার সুবাদে সেদিন কবিতা নিজেকে অনায়াসে দাঁড় করাতে পেরেছিল অভিনব নানারূপতার সামনে, সমৃদ্ধি এসেছিল ভাষাবৈভিন্ন্যের সূত্রে। নানা ঘরানার উপস্থাপনায় সেদিন কবিরা যা করতে চেয়েছিলেন, সেই চাওয়াটা সম্ভবত ছিল পাঠকশ্রেণীরও। বিষ্ণু দে-র ভাষায় বলা চলে,

রবীন্দ্রব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎসে খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের
(২৫শে বৈশাখ, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)

'প্রাণের গঙ্গা' খোলা রেখে এই আরেক 'সমুদ্রের দিকে' যাওয়া 'সদাই নূতন চিত্রে' রুদ্ধ উৎসে খুঁজে পাওয়া খরোস্রোত, এও তো ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসা আরও এক ঐতিহ্যের উদ্ভাস, ঐতিহ্যের ভাঙচুর ঘটিয়ে অন্য চরিত্রের ঘরানার প্রবর্তনা। এবং নির্মাণকে বাঁচিয়ে রাখতেই এই বাঞ্ছিত ভাঙচুর, শিল্পিত তছনছ। সেই কবে থেকে কবিতার পাঠক এসবে সম্মতি জানিয়েছে, জুগিয়েছে সহৃদয় সমর্থন কারণ তার সমর্থনের আড়ালে একটা সত্যকেই সম্ভবত সে ধ্রুব বলে মেনে নিতে পেরেছিল : কবিতা একরকম নয়, অনেকরকম, বহুজাতের ঘরানায় সে বিশ্বাসী, নানা প্রশাখায় সে মেলে দিতে পারে আপন সম্ভাবনা, ক্রমিক নিরীক্ষাই বিচিত্রমুখী করে তুলতে পারে তার যাবতীয় চর্চা আর আঙ্গিক।

ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যই যদি না থাকত তবে জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-সঞ্জয়-বুদ্ধদেব

বিষ্ণু দে পেরিয়ে সমর সেনের গদ্যাশ্রয়ী কবিতাঘরানাকে আমরা অভ্যর্থনা জানাতাম কি করে? তিনি কি প্রাক্তন ঐতিহ্যকে অসম্মান করে তাঁর নতুন কবিতারীতির উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন, নাকি সেদিনের পাঠক মুঠো ভ'রে অনাদর ছুড়ে দিয়েছিলেন তাঁর মূলত গদ্যনিরীক্ষার দিকে?

আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, চালচুলো বজায়ের চেষ্টা তাই আছে।
কিছু গুণ হয়তো একদা ছিল, এখন ঘুণের পালা।
এ বাঁজা বছরে এক একটি দিন শেষ হয় সন্ধ্যার আড্ডায়,
ঘরে ফিরে গম-বজরার রুটি, কিছু পরচর্চা,
ঘুমের আগে ইতস্তত চিন্তা, অস্বস্তি;
বাইরের রাত্রি হয়তো নিটোল নিবিড়,
আধো-ঘুমে আধো-স্বপ্নে আমার রাত্রি কাটে,
অধিকাংশই উৎকণ্ঠার স্বপ্ন (ক্লান্তি)

এই যে গদ্যের চাল ও চরিত্র, এ তো সেদিন মেলেনি কারুর আঙ্গিকের সঙ্গেই, কিন্তু মেলেনি বলেই কি অবজ্ঞাত হতে হয়েছিল সেদিন তাঁকে, তাঁর কবিতাকৃতিকে? বরং মেলেনি বলেই না তাঁর নতুন প্রকরণের শিরা-উপশিরায় আমরা তখন আবিষ্কারের উন্মাদনা পেতে চেয়েছিলাম, দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, নতুনতর ভূখণ্ডের ওপর। বুদ্ধদেবের আঙ্গিকের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল না সমর সেনের আঙ্গিকের, তবু মুক্ত মনের দাক্ষিণ্যে সেদিন বুদ্ধদেবই কিন্তু তাঁকে জ্ঞাপন করেছিলেন উষ্ণতম অভ্যর্থনা:

১· তাঁর গদ্য-ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোনো কবির ছাঁচে ঢালাই করা নয়।…এই যুবক-কবি কেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কখনোই পড়েননি, সেটা আমার আশ্চর্য লাগে।

২. বাংলা গদ্যছন্দকে এই তরুণ কবি যে-রূপ দিয়েছেন, সেটা আর কারোরই নয়; তিনি আবিষ্কার করেছেন এই ছন্দের অভিনব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। এ-গদ্য গল্পে বা প্রবন্ধে ঠিক ব্যবহার্যই নয়; এ যেন বিশেষভাবে কবিতারই বাহন।

(সমর সেন: কয়েকটি কবিতা: কালের পুতুল)

এই দুটি উদ্ধৃতির কোনওটিতেই কি ঐতিহ্য অস্বীকৃতির প্রমাণ মিলল কোনওভাবেই? মিলল না। বরং দেখা গেল প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত প্রভাবের কাছে সমর্পণ করাটা স্বকীয়তার প্রতি এক বিরাট অবিচার; ঐতিহ্যকে অসম্ভ্রম

করা নয়, কিন্তু একই সঙ্গে যাচাই হওয়া দরকার নিজের সামর্থ্যের, নিজস্ব যোগ্যতার। আর সে যোগ্যতাকে মুদ্রিত করতে গেলে তো কবিতাকেই করে তুলতে হবে অনেকরকম।

এই অনেকরকম কবিতা চর্চিত হয়েছিল বলেই সেই কবে থেকে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম একেক রকম স্বরায়ন, একেক ভঙ্গিমার উচ্চারণ, আর বহুস্তরী বাক্-প্যাটার্ন। কারুর সঙ্গে যখন মিলল না কারুর শৈলী আর স্বভাব, তখনই প্রকাশ্য হল স্বকীয়তা, অনেকের মধ্যে তখনই একেকজন হয়ে উঠলেন একক, দ্বিতীয়রহিত। এভাবেই নতুন ডিক্‌শনের নির্মাণে একেবারে নিজস্ব ঘরাণা গড়ে তুললেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; প্রথমজন নির্ভরতা রাখলেন কথ্যচালের প্রকরণে, দ্বিতীয়জন এর সঙ্গে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করলেন ধ্রুপদী তৎসম শব্দের প্রয়োগ কুশলতায়। এবং অসাধারণ ছন্দবোধ রইল দুজনেরই একেবারে হাতের মুঠোয়। পঞ্চাশে পা দিয়ে কবিতা ফের বাঁক নিল একেকরকম পথে। সোচ্চার হয়ে কেউ উচ্চারণের আদল গড়ে তুললেন নিজের মত, কারুর কবিতায় ধরা রইল শুধু নিভৃত স্বগতকথন, ছন্দে ততটা সম্পন্ন নয় বলে কেউ আশ্রয় নিলেন সংবেদী গদ্যে, আবার বহুমাত্রিক বিষয় ভাবনার সঙ্গে কারুর হাতে ঝলসে উঠল ছন্দের নানান সম্ভাবিত নিরীক্ষা। কিন্তু একেক রকমভাবে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে কেউ কারুর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন না এতটুকু।—

শেষ বিকেলের সেই ঝুল বারান্দায়
তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
নীরার সুষমা
চোখে ও ভুরুতে মেশা হাসি, নাকি অভ্রবিন্দু? (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

ওই যে দূরে দেখছো বাড়ি—ওখানে পৌঁছাতে
অনেকগুলো রাস্তা ছিলো চলন্তিকার হাতে
একটি ঘুরে, একটি দূরে, একটি চোখের সোজা—
গোপন যিনি ছিলেন, তাঁকে বয়সকালে বোঝায়। (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

ধ'রে ধ'রে কবিতা লেখার হাত
ভেঙে যায়, থাকে শুধু গাভীর মতন নীরবতা।
দাঁত-করাতেরা সব বনের ভেতর থেকে শিস্ দিয়ে ওঠে—

কবিতা কি তার মতো? মৃদু ও অমোঘ? অবারিত (প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত)
তোমাদের মুখে আমি হাত রেখে বলিনি কখনো
'এখন কেমন আছো? বেঁচে আছো নিজের নিয়মে?'
শীতের পাহাড়তলি আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল
তোমাদের মুখে আজ ছুঁতে চাই সমস্ত মানুষ (শঙ্খ ঘোষ)

ও গেল যখন, পড়োশি মাঠের একটিও ঘন ঘাস
কোনো শিশিরের আর্শিতে তার মুখ
দেখতে যায়নি, ঝাউয়ের খোঁপায় অজস্র বিশ্বাস,
ঝর্ণার জল সরল, অকৌতুক। (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেল—এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হলো ফল (বিনয় মজুমদার)

স্বাতন্ত্র্যের এইসব উজ্জ্বল নজিরই একদিন চিহ্নিত করেছিল পঞ্চাশকে, কাজ করেছিল তার রক্ষাকবচের। ষাটেও দেখেছি একেকজন একেকরকম করে বুঝে নিতে চেয়েছিলেন তাঁদের নিজস্ব কবিতাভাষা। ঘরানার ভাঙচুর হয়েছে অনেক সময় আন্দোলনের পথ ধরেও, পেয়েছিলাম শ্রুতি আর হাংরি কবিতার পাশাপাশি তত্ত্বপ্রধান কবিতা, কবিতাবিরোধী কবিতার সঙ্গে যুগপৎ চলেছিল রাজনীতি-নির্ভর এবং অন্তর্মুখী কবিতার নিরন্তর চর্চা। পাঠক হিসেবে আমরা কাউকেই খারিজ করিনি কারণ বিচিত্র ঐতিহ্যবাহী উচ্চারণই যে সম্ভাবনার এক-একটা দরজা-জানালা খুলে দেবে কবিতায়, এনে দেবে নীল আকাশ থেকে এক ঝলক মুক্ত বাতাস, তা আমরা জানতাম, আর জানতাম বলেই আমরা উৎসুক তাকিয়ে-ছিলাম নানারকম স্বপ্নের প্রতীক্ষায়।

'বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়। / বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে'—চিন্তায় একান্নবর্তী হওয়া যে মিলিত মৃত্যুরই নামান্তর; এ সত্য জ্ঞাপন করতেই চল্লিশের কবি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছিলেন একদিন; কিংবা 'এখন মতান্তর বাড়াই জরুরি তা না হলে / আর কোনোদিনই আমরা / পরস্পরের মধ্যে নিজেদের খুঁজে পাব না'—সংবর্তের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই উপলব্ধি হয়েছিল পঞ্চাশের এক কবিরও। 'দ্বিমত' মানে তো হতেই পারে

কবিতা সম্পর্কে দ্বিতীয় কোনও মতের প্রতিষ্ঠা বা অনুসরণ; দ্বিতীয় বিদ্যায় আস্থাস্থাপন তো এক অর্থে দ্বিতীয় কি তৃতীয় কোনও তত্ত্বের প্রতি ভরসা বা নির্ভরতা। কবিতাকে পুষ্টি যোগাতে তাত্ত্বিক বিরোধিতা? সেও তো অভ্যর্থিত হতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই সহনীয় হবে তার মাত্রা, আর তা হলেই তো আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে কবিতার কাঙ্ক্ষিত তৃতীয় ভুবন। মতান্তরও জরুরি হয়ে উঠতে পারে কোনও কোনও সময়, পারস্পরিক শনাক্তিকরণের জন্যও অনিবার্য হতে পারে মতের ভিন্নতা, ঘরানার প্রভেদ, ভাষাচরিত্রের মেরুব্যবধান। আজ সত্তর-আশি অতিক্রম করে বাংলা কবিতা যখন নব্বই দশকে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে গেছে, উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত হয়েছে প্রোজ্জ্বল অতীত, যখন অনিঃশেষ নিরীক্ষায় আলোচিত হয়ে উঠতে চাইছে কবিতার সর্বাঙ্গ, তখন নির্ধারিত ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসে নানা দিকে আবার একবার ছড়িয়েই যাক না কবিতার রোদ্দুর-আলো-অন্ধকার, মহাদিগন্তের দিকে আরও একবার হেঁটে যাবার মাহেন্দ্রমুহূর্ত রচনা করে নিক তার পাঠক। উত্তর-আধুনিকের বিশ্বস্ত চর্চায় আজ যেমন নিবেদিত হতে পারে পুরাণের অনবদ্য ব্যঞ্জনা,

আমার সর্বস্ব বলতে পোড়া হাঁড়ি, কানাভাঙা থালা
একপেট খিদে
তাই নিয়ে বসে পড়ি, যেখানে যেমন পারি, যেমন বিধেয়
ভারতগাথায় আমি বিস্ময়চিহ্নের মতো; মাগো ফ্যান দাও!
(অমিতাভ গুপ্ত)

তেমনি অন্যতর কোনও দ্যোতনাও তো এই মুহূর্তে কবিতাবিরোধী কবিতার সূত্রে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে আমাদের সাম্প্রতিক কবিতাপাঠ; তার সঙ্গে হয়ত মিল থাকে না পৌরাণিক অনুষঙ্গের কিংবা লোককথার ভাবনা-বিস্তারের, তবু আমাদের জেনে নিতে হয় বহুতর বৈচিত্র্যকে অভ্যর্থনা জানিয়েই এগিয়ে যাবে কবিতার নানারকম পথ, গতানুগতিক বিষয়ভাবনা আর ভাষা আঙ্গিকের উল্টোপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতেই একদিন কবিতা পৌঁছে যাবে অন্য উচ্চারণের কবিতার দিকে, কবিতারই দিকে; কবিতার আগে থাকবে না কোনও তত্ত্ব, কবি বলে উঠবেন না এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় আমি লিখলাম এই কবিতা, তত্ত্ব যদি উৎপন্নই হতে চায় হোক কবিতা লেখার পরে। এই যে প্রতিকবিতার উত্তীর্ণ দৃষ্টান্ত,

বিষাদ কারো কারো যকৃৎ ফুটো করে দেয়।

এই তো, শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়েছি, বিষাদবাবু

একটা মেয়ে আমাকে ভালোবাসল না বলে

সবকিছু শেষ হয়ে যায় নি আমার

সে চলে গেছে! কোথায় গেছে বলে যায়নি।

তাই বলে আমি তার পেছন পেছন ঘুরব?

সেটা খুব ছোট কাজ। জীবন অনেক বড়।

মিঃ বিষাদ, ওই তো তাজবেঙ্গল, গাড়ি থামান, এক কাপ কফি

খেয়ে আসি, চলুন। (সুবোধ সরকার)

এর মধ্যেও ঘুমিয়েছিল অন্যজাতের কবিতার সম্ভাবনা, আর সে সম্ভাবনাকে বুক পেতে উষ্ণ গ্রাহ্যতা জানাবার জন্য আজ তৈরিও থাকতে হবে আমাদের মত মুক্তমন পাঠককে। পুরাণ-নির্ভর ধ্রুপদী কবিতাও যেমন চিরকালীন সম্পদ হয়ে থাকবার যোগ্যতা অর্জন করে নিতে পারে, অ্যান্টি-পোয়েট্রিও কালান্তরে হয়ত কবিতাকে সম্পন্ন ও অর্থান্বিত করবে অন্য মাত্রায়, অন্যতর চরিত্রে। প্রেক্ষিতের তারতম্যে কবিতায় 'পুণ্যিপুকুর' আর 'ব্রতকথা'ও যেমন অনিবার্য, তেমনই জরুরি হয়ে উঠতে পারে ওই 'তাজবেঙ্গল' আর 'মিঃ বিষাদ'। এ সবই আমাদের জীবন-যাপন থেকে জেগে-ওঠা উপকরণের রকমফের। আর এসবের উদার অন্তর্ভুক্তিতেই তো কবিতার বাঞ্ছিত যাবতীয় সিদ্ধি। আমাদের জীবনানন্দও চাই, সুধীন্দ্রনাথও চাই, আমাদের সমর সেনও চাই, আমাদের বিষ্ণু দে-ও চাই, আমাদের উত্তর-আধুনিক কবিতাও থাক, সঙ্গে প্রতিকবিতাও থাক। আবার এ-সবের পাশাপাশি 'মিথ' কথনে নয়, গদ্যের চলনেও নয়, ছন্দে এবং অতলান্ত তন্ময় অনুভবকে একক অনন্যতায় স্পর্শ করে যখন এই মুহূর্তের আরেক কবি গড়ে তোলেন মহত্তর ব্যঞ্জনার জগত, তখন ভূমিষ্ঠ হয় আরেক কবিতা, আরেকরকম কবিতা:

ঝরে পড়ে রাত্রি মোম, আমি তাকে ধরে রাখি ফুলে

উঠেছে বাঁকানো চাঁদ, মুছে গ্যাছে লোকের বসতি

পর্বতচূড়ার গায়ে মিশে গেলে অন্ধকার কাক, মনে পড়ে

আমার পিতার শব একদিন বহন করেছি বনপথে

রাত্রি মোম, জানো কিছু? জানো, মৃত্যু ছিল এক নারী?

বনে সেও শুয়ে ছিল আমার যাওয়ার পথ ঢেকে;

তাকে বাধা দিতে গিয়ে, তাকে তুলে নিতে গিয়ে, শোনো—

আমার জন্ম হলো আবার ফুলের পাত্রে এসে! (জয় গোস্বামী)

আমরা যারা কবিতাপাঠকে অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ করার পন্থা হিসেবে মেনেছি, আমরা যারা কবিতাকে স্মরণীয় উচ্চারণ বলে জানি, দেখেছি নিরীক্ষা আর দক্ষতার অনেক স্ফুরণ, তারা কবির নিরন্তর জন্মে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস রাখি কবিতার পুনর্জন্মেও। কারণ, পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই।

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

খিদে

সে গাছ খায় পাথর খায় লতা পাতা ফুল
সব কিছু খেতে খেতে পেট না ভরলে সে মুদ্রা রাক্ষস
আকাশ খায় মেঘ খায় সঙ্গীতের মর্মর
কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নাচায় সে যুবতী পুতুল।

এতো খিদে খিদের কোন মা বাপ নেই শিকড় নেই
ডাল পালা কিংবা মুকুল।

সে পুরুষ খায় নারীকে খায়
ছিঁড়ে ফেলে নীলপদ্ম গোপন কমল
নদীর গেরুয়া জলে হাত ধুয়েও পিপাসা মেটে না।

সে তার খিদেকে নিয়ে পৃথিবী শাসন করছে নপুংসক তেজে
কেউ তা জানে না।

বার্ণিক রায়

পুরূরবা-উর্বশী : চূর্ণ কবিতা

এ হৃদয় পুরূরবা কামনা আমার মৃত্যু, জীবন উছন্ন,
রমণীর প্রেম ক্ষণস্থায়ী নারীও নেকড়ে মুখে তুলে রক্ত শোষে।

রূপমতী, উজ্জ্বলতাময়ী, সহৃদয়া, সুমিত্রা বিদূষী কেউ নেই আর,
শুধু মায়া, ভ্রান্তি ; নক্ষত্রের হে আলোক, তুমি থাকো চোখে।

এইটুকু ক্ষণকাল কেন রইলে এখানে অদিতির আলো শেষ হবার আগেই অন্তর্হিত
আমার আকাশ প্রিয়াহে উর্বশী, আলিঙ্গন করেছি তোমাকে, এই শুধু সুকৃতি
আমার।

তাইতো আনন্দ দাও অন্তরিক্ষের আলোয় যতোক্ষণ বেঁচে আছি ;
তোমার বিচ্ছেদ তবু সমুদ্রে সূর্যের আলো নিয়ে সর্বদা কাঁদায় একা।

বিদ্যুতের মতো ক্ষণিকের উজ্জ্বলতা রক্তের ভেতরে দিয়ে কোথায় লুকোলে ;
কেন ত্যাগ করলে আমাকে, রক্তে দিব্য দ্যুতি কাঁদে, শূন্য গৃহ।

পৃথিবী আকাশ কাঁদে দিন রাত্রি তুমি আমি চুম্বকের আকর্ষণ
সূর্যরশ্মিময় চন্দ্রের আলোয় জল এক হয়ে আছে আকৃতিতে।

তুমি আমি দিনরাত্রি পতিপত্নী এ শয্যায় সঁপে দিই দুজনের আলিঙ্গনে,
এখানে সৃষ্টির রথে দুজনে চাকার মতো এক সঙ্গে ঘুরছি কেবল।
তুমি নারী, ব্যথা দাও শুধু তোমার কথায়, পাই না কখনো,
ভাঙা চাকা পড়ে থাকে, তুমি কোন্ কোথায় উধাও হয়ে যাও।

তবু দিবসরাত্রি এক হয়ে গেছে অন্ধকার গুহায় জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে ;
অনাথ, অনাথা তুমি, এমনি করেই রাত্রির পেছনে দিন চেয়ে থাকে।
এ শুধু কামনা, শরীরে শরীর মিলে যায়, সূর্য চেয়ে থাকে,
চাঁদের আলোয় ফুল শিশিরে জেগে থাকে, দিনে মরে যায়।
তোমার গলার হার যেমন উজ্জ্বল দ্যুতিময় মাটিতে পড়লে
মানুষ মাড়িয়ে চায় ধুলোয় নোংরায় ঢেকে থাকে।
এমনি আবৃত হয়ে আছো, পৃথিবীর এ ধুলো সরিয়ে
আমার নিভৃত হার চন্দ্রের সমূহদ্যুতি দেখতে পাই না!
এ বিশ্ব বিমুখ অনাথ ভিখিরি চেয়ে থাকে চলতি গাড়ির দিকে।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

বে র ক রো

কে পড়বে তোমার কবিতা তুমি ছাড়া।
এখন অনেক রাত
ঘুমায় মানুষ, মানুষ-বৌ,
ঘুমায় কাচ্চারা। চিড়িয়াখানার যেই
চপল শিম্পাজি সিগারেট খেয়ে
হাসিয়েছে নবীনের নতুন বৌ-কে—সেও ঘুমে
কেঁপে কেঁপে ওঠে।
তুমি শুধু নিজের কবিতা পড়ে যাও রাতভর
নিজ নিজে।
ফ্রিজ-টিভি কিছুই রাখদি বাদ
স্কুল বাস, গানের মাষ্টার
বাথরুম ধোবার লোক রান্না ও কাপড় কাচার লোক
বাহ্য কম বেশী হলে প্রেসক্রিপসন লেখার লোক—
রাখ নি কিছুই বাদ। তবু কেন
বোজানো দরজা ভেদ করে
আছড়ে পড়ে নরুন ও নাকের হাঁকডাক, কেন
দূরে চিড়িয়াখানার থেকে ভেসে আসে অন্যসব
নাকেদের ডাক।
কে পড়বে তোমার কবিতা? নিজে লেখো,
বের করো 'দেশ', ছাপো
ছাপো খালি নিজের কবিতা আর রাত জেগে
একা, খুব একা একা পড়ো।

তা র আ গে

এসো পূর্ণ করো, নিয়ে চলো মেঘের ভেতরে।
কি করে ঘনায় বৃষ্টি, কি করে বৃষ্টির ভেতর থেকে
ছুটে আসে শিলা, তা কি তুমি জানো? এসো,

পূর্ণ করো। শুধুই ভোরো না পাঁউরুটি
টিফিন কৌটয়, ঠেসো না আলুর তরকারি। পৃথিবীতে
আরো জরুরী অনেক কাজ আছে। এসো পূর্ণ করো,
এ শরীর নিয়ে চলো মেঘের ভেতর,
বৃষ্টি হয়ে যা নামবে তোমার শরীরে।
তারপর বৃষ্টি মাথায় করে যে আসবে কাল,
সে যদি ছাতার মত কালো হয়, সে যদি হর্ষদ মেটার মত
হয়, তাকে তাই হতে দাও! তার আগে
এসো, পূর্ণ করো; এসো পূর্ণ করি আর উড়ে যাই
মেঘের ভেতর থেকে মেঘের ভেতরে।

অভী সেনগুপ্ত

আ ড়া লে র ক বি তা

মেলামেশার প্রত্যেকটি রাস্তাই আজ আমাকে আড়াল ক'রে দিচ্ছে তোমাদের কাছ থেকে। মৃদঙ্গে বোল তোলার কথা ছিলো যেখানে, সেইসব বিধুর মুগ্ধতাকে পরিত্রাহী চিৎকারে একেবারে লোপাট ক'রে দিচ্ছে দামামার রণবাদ্য। কোনও উপায় নেই দেখেই এমন ঘরকুনো হয়েছি আমি। দেখতে পাচ্ছি, আমার চিবুকে বুকে-পিঠে লেগে রয়েছে আমারই হাতচাবুকের দাগ। বুকের যে পাঁজর-গুলোতে বসে পাখিরা গাইতো অন্যমনস্ক গান, সেখানে ফিসফিস স্বরে কথা বলে এখন রাজ্যের উৎকণ্ঠা। চাঁদের ও-পিঠের অন্ধকারে আলো জ্বালতে চ'লে যাচ্ছে একে-একে প্রিয় মানুষেরা। যদি অন্ধকারেই আলো জ্বালতে হয়, তবে এই স্থানকাল কী দোষ করলো?—এমন সব স্বপ্নের দুঃস্বপ্নের জট খুলতে-খুলতে ঘুম ভাঙছে আমার।

কবিরুল ইসলাম

দী ঘা র ক বি তা

১

এসেছি দীঘার দিকে সমুদ্র সকাশে
আর মাত্র কিছুদূর দক্ষিণে জানালা
অনর্গল রৌদ্র-হাওয়া কিঞ্চিৎ শীকরে
দুপাশে গাছপালা ছিঁড়ে ছুটে যাচ্ছে বাস
বৈশাখের রুদ্রে আজ সমুদ্র উতলা
নগ্ন পায়ে হুমড়ি খায় ঢেউ-এর অক্ষর
প্রকৃতির গ্রন্থমালা স্বয়ং নির্মাণ
পড়ুয়া কে আছো, এসো, নান্দীপাঠ করো ।

আমরা দুজন শুধু দূরে ঢেউগুলি
'সমুদ্র দেখার বড়ো সাধ ছিলো মনে'
এই দীঘা দিয়ে গেলো পুরীর হাতছানি
অতলান্ত জলে খেলে দুরন্ত নুলিয়া
যে-জল তাদের স্বপ্ন আত্মীয়তা গড়ে

ঢেউ-এ-ঢেউ-এ নাচে ফেনা জীবনে, মৃত্যুতে ।

২

এসো, কে সমুদ্রে যাবে ? কার কণ্ঠস্বর
ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে আকাশে হারায়
দিবারাত্র জুড়ে কার তর্জনী গর্জনে
দশ দিগন্ত মহোৎসবে করুণ বেহালা
বেজে যায় ভিজি যোগ, বিয়োগে বিচ্ছেদে
ঝাউগাছ মাথা নাড়ে : এই তো সময়
কিছু বাণীবদ্ধ করো, ভোরের ক্রন্দসী,
হু-হু হাওয়া দূরে, কাছে বুকের ব্যঞ্জনা

আমার সঙ্গিনী, এসো পোশাকী আঁচল

এক মুহূর্তে উড়ে যাক, উড়ুক পতাকা
ফেন-শীর্ষ ঢেউ-এ দাও একশাড়ি অঞ্জলি :
আজ আমার জন্মদিন পবিত্র প্রসবে
যা কিছু বাহুল্য ছিলো পরিত্যাগ করো
যেহেতু দুজনে লগ্ন বিবাহ বাসরে ॥

৩

সারারাত্রি লণ্ডভণ্ড বাতিল বিছানা
জানলা জুড়ে ঢুকে পড়ছে হাওয়ার মাতাল
এসো, ব্যালকনি খোলা, বিস্রস্ত শাড়িতে
দাঁড়াও দুদণ্ড, দ্যাখো, ভোর উঠেছে ফুটে
ডিমের খোলশ ছিঁড়ে যেমন শাবক
প্রথম পৃথিবী দ্যাখে খাবারের স্বাদে

এক্ষুণি সকাল হবে দূরের ইশারা
ঝাউ-এর ডগায় আর আছড়ে পড়া ঢেউ-এ
অবিরাম জলোচ্ছ্বাস সূর্যোদয়ে লাল
দর্শনার্থী কেউ কেউ নত নমস্কারে ।

ঠিক মল্লিকার মতো একজন যুবতী
সীমান্ত ঢেউ-এর সঙ্গে পিছু হেঁটে এলো
আজানু ভেজানো শাড়ি, ঢেউ কি তাহলে
আরও উচ্চাভিলাষী ছিলো, মানুষের মতো—

প্রকৃতি যেখানে শেষ, মানুষের শুরু ॥

৪

এই মাত্র সূর্য উঠলো মেঘের চাদরে
সমুদ্র-বলয় ঘিরে আচ্ছন্ন আকাশ
যতদূর দেখা যায় জল শুধু জল
জেলেরা নামাচ্ছে নৌকা মাছের সন্ধানে
সুবেশ নায়কও আজ মৎস্য শিকারী
ছেঁড়া গেঞ্জি, লুঙ্গি পরে সাহসে ভরপুর
এই মাত্র নৌকা ভাসলো বিরুদ্ধ বাতাসে

ঈশ্বর কেবল সাক্ষী রুজি ও রোজগারে
নুন-আনতে-পান্তা-ফুরানো-যে-সংসার
তাকে একটু পা মেলাতে চায় সে এভাবে
ঈশ্বর কি এতো সব খবর রাখেন ?
দয়াময় ফলদাতা সর্বজ্ঞ যে-জন
মানুষের দুঃখে তিনি হয়তো অবিচল
এমন নৈরাজ্য তাই গা-সওয়া হয়েছে ॥

৫

দীঘার অমরাবতী পার্কের দৌলতে
এক মাইল হাঁটা গেলো পথে-বিপথে
এখানে সৈকত ছেড়ে মরীচিকাবৎ
নৌকা-বিহারের একটু আয়োজন আছে
এক টাকার বিনিময়ে চক্রাকারে পাড়ি
এই লেলে, ঐ দ্যাখো, কৃত্রিম দ্বীপ
সবুজ গাছপালাময় সতর্ক প্রহরা :
ফুটেছে গুলঞ্চ যুঁই, মোশান্ডা, বেলফুল
ড্রুপিং দেবদারু বীথি ঝাউ, ফার, কাজু
সবুজের সমারোহ চারচোখ-জুড়ানো

দাঁড় ও হালের মাঝি নৌকা দিলো ছেড়ে
কুড়ি মিনিটের যাত্রী, যাত্রিনীর মুখে
ফুটেছে আনন্দ রেখা বেগুনি জটিলে
লতানো আমের গাছ, পা ছুঁয়েছে মাটি।

৬

প্রথমবারের মতো সূর্যাস্ত সময়ে
দীঘায় এসেছি আমরা : আপাতত আছি
পুলিশ হলিডে হোমে নিশ্ছিদ্র নিয়মে।
সম্মুখ টেবিল জুড়ে পূর্বের জানালা
হাত ধরাধরি করে সারিবদ্ধ, ঝাউ
যেন মার্চ করে যাচ্ছে ঐ দূরে, কাছে
পশ্চিম-বারান্দা থেকে জলের কল্লোল

একটু হেঁটে চলে যাই অদূর সৈকতে
ঢুকে পড়ি কালীপদ নায়কের স্টলে
রবীন্দ্রনাথের মুখ মস্ত ক্যালেন্ডারে

ক্রিম ক্র্যাকারের সূত্রে জমাটি নাটক
নরেশ দামের হাতে মিলনান্ত হলো
উইল্‌স্‌ ফিল্টারে আর আধ কাপ চায়ে
যে-তুফান উঠলো তার উপমান নেই।

৭

কী জানি কী লেখা আছে, পড়তে জানি না—
কে জানতো দীপের কান্ডে উদভাসিত প্রেমে
এভাবে ডাবের জল, অধিকন্তু শাঁস
তৃষ্ণার আরাম খাদ্যের যোগান

ভাত জল আলু সেদ্ধ পমফ্রিট ভাজা
আনন্দে বিহল হলো এক চিলতে ভোজ

দুটুকরো গেলাশ রুটি আগুনের আঁচে
কিঞ্চিৎ পোড়ানো গন্ধ মুচমুচে স্বাদ
ঈষৎ ধোঁয়ার বাষ্পে এক কাপ চায়ে
অমৃত পালার যেন তৃষ্ণা মেটেনা—
আরও এক কাপ দাও, পান করে বাঁচি
রং-করা সাদা বেঞ্চ যেন সিংহাসন
সকালে, দুপুরে, রাতে কন্‌ডেন্সড্‌ মিল্ক

এ-যাত্রা দীঘায় এসে আত্মীয়তা গড়ে ॥

৮

আজ নৌকা নামানো যাবে না এতো হাওয়া :
প্রকৃতি মাতাল হলে কার সাধ্য যায় ?
জেলেরা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে
সমুদ্রে ভাসীর নৌকা কেউ-কেউ ফেরেনা

তবু আজ তারা কেউ সমুদ্রে যাবে না
যেহেতু জীবন একটাই তাই জেনে শুনে
মৃত্যুর হাওয়াকে কেউ কি আলিঙ্গন করে ?

তাঁদেরও সংসার আছে, বাচ্চা-কাচ্চা আছে
বৌ আছে, ঝুপড়ি আছে, মা-বাবাও আছে
যদিও অন্নের দাস, না গেলে উপোস
দিন আনে, দিন খায়, হাড়ভাঙা খাটুনি
দুবেলা দুমুঠো অন্ন পেটে পড়া চায়
পেট তো কখনও কারও বশ্যতা মানে না—

না-হাওয়া, না-ঝড় বৃষ্টি নিরন্ন নিষেধ ॥

৯

আবার অমরাবতী আবার আবার
নৌকা বিহারের ছলে সহজ সুন্দরী
হুহু হাওয়া লেপ্টে যায় বহুমূল্য শাড়ি
হঠাৎই উন্মুক্ত হয় স্বর্গের জানালা…

তরলা বাঁশের কঞ্চি গণপতি শীট
এক কাঁধ বোঝা নিয়ে হঠাৎ দাঁড়ালো
আমি একটা চেয়ে নিই ইচ্ছে ছিলো বলি
তুমি কি জানো না বাঁশ কঞ্চি থেকে দড়ো—
এভাবে বাঁশের অঙ্গচ্ছেদ করো কেন ?

আমার হাতের কঞ্চি উড়ে উর্ধ্বাকাশে
একটা পতাকা তাতে জুড়ে দিতে পারো
চার জনের নৌকা ধীরে জল কেটে এগোয়
জল-শিউলি-ফুল-শুদ্ধ আমি তুলে নিই
কঞ্চির ডগায় :   দুজন যাত্রিনী হেসে ওঠে ॥

১০

বিদায়, অমরাবতী, বিদায়, সীবীচ সৈকত
পুলিশ হলিডে হোম, বিদায়, বিদায় !

পাঁচ দিনের পুঞ্জ স্মৃতি পুণ্যের সঞ্চয়
নৌকা বিহারের সঙ্গী তপতী, বিদায়
ধন্যবাদ স্বপ্ন, সৌজন্যে আমরা ঋণী
এভাবে জীবন ধারা স্রোতস্বিনী হয় ।

কে জানে কোথায় আজও দূরের হাতছানি
অদূর আহ্বান তবু সমগ্রে একক
তেমন সেচনে মরু ফসলে সবুজ
বহু যত্নে ঘামে গড়ে শিল্পীর রচনা
কে কবে দিয়েছে তাকে যোগ্য সমাদর ?

দীঘার সৈকত জুড়ে পড়ে রইলো ঢেউ
ফেনার বিচিত্র শিল্প, অনন্ত ঝিনুক
মেঘলা-সমুদ্র-হাওয়া, তোমাকে বিদায় ॥

১১

একী কবিতার জ্বর, যা ঘটলো দীঘায়
সমুদ্র-সৈকতে আর চায়ের দোকানে
আমার সঙ্গিনী আজ পঁয়ত্রিশ বছর
কিন্তু তাঁকে এতো কাছে পাইনি কখনও
এরই নাম কি হানিমুন যা মধু চন্দ্রিকা ?

প্রতিদিন যে-সম্পর্ক ব্যবহারে ম্লান
দূরে গেলে কাছে টানে, সূর্য-স্নাত হয়
মাত্র এইটুকু শুধু তাৎপর্যে প্রতীকী
এইভাবে একটি দিনই সম্পূর্ণতা পেলে
চিরদিন তুচ্ছ হয় ব্যাপ্ত গুণাগুণে

যা কিছু দৈনিকী দূরে নয়নের মণি
তাই কি প্রবাসে গেলে ঘরে ফেরা হয় ?

চার দেয়ালই ভেঙে পড়ে আপনা আপনি ঝড়ে
ফলত, এভাবে নিকট দূরে দিগন্তে হারায় ॥

রত্নেশ্বর হাজরা

ই তি হা সে র কে উ

আর কতদূর গেলে দেখা হবে নির্জনতায়
পাশে বালিয়াড়ি
ছায়া হয়ে আছে বাবলার বন
দস্যুর ভয়…
মন্থর হাওয়া কখনো কখনো যেন দৌড়বাজ
ফণীমনসার ঝোপে ঢুকে যায়। কেউ নেই। কেউ
বহুদিন পায়ে হাঁটেনি সেখানে
যদি দেখা হয়
ইতিহাস—তবু যেন খুব চেনা—যার পায়ে পায়ে
হেঁটে যেতে যেতে দূর দূরান্তে হেঁটে যাওয়া যায়!

আর কতদূর গেলে দেখা হবে (দেখা হতে পারে)
যেখানে মেলায়
ভিড়ে ভিড় শুধু—ভিড়ে আর ভিড়ে
একাকার হয়ে আছে মুখগুলো
হৈ হুল্লোড়ে বড় সাধারণ **চ-ছ-জ**
উঠছে নামছে—কখনো ঘুরছে—নাগর দোলায়
গতানুগতিক
গতানুগতিক
গতানুগতিক…
তার মধ্যেই যদি দেখা হয়! ইতিহাস—তবু
যেন খুব চেনা—যার পায়ে পায়ে
হেঁটে যেতে যেতে একুশ শতকে হেঁটে যাওয়া যায়!

কালীকৃষ্ণ গুহ

মা নি ক, শা ম শে র

মানিক অনবরত বুড়ির কথা বলতো, আর মাঝে-মাঝে শামশেরের কথা। শামশের ছিলো মানিকের একমাত্র বন্ধু।
মানিক তার নিজের বাড়ির শান্ত পরিবেশে পুকুরের ধারে মারা গেল। মৃত্যুকে এড়ানোর কোনো উপায় ছিলো না তার।
হতবুদ্ধি শামশের বহু প্রশ্ন ক'রে, উত্তর না পেয়ে, আত্মহত্যা করলো। এখন তার তরুণী স্ত্রী দুটি শিশুকন্যা নিয়ে আরো বেশি হতবুদ্ধি।
মানিকের পালিত কন্যা, বুড়ি ক্রমশ সুন্দর হয়ে উঠছে মনে হয়। আর মনে হয় বুড়িকে নিয়ে লেখা মানিকের কবিতাগুলি অনেকদিন ধরে পড়া হবে।

পা প

তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করো।
আমি লক্ষ করি, আমার পিছনে মৃত্যু যা
তোমার ভর্ৎসনার চেয়েও অনিবার্য; সামনে
তোমার দীর্ঘ বিস্ফারিত চোখ!

বলি, চোখ বন্ধ করো—
আমার সবটুকু পাপ তুমি কোনোদিন দেখতে পাবে না

গণেশ বসু

প্রার্থনা

এ কোন্ কালো দিঘির থেকে উঠলে জেগে ঢেউ
মাথায় জবলে চিতা
দুহাতে নদী, দুপায়ে কাদা, শরীরে খেলে যায়
কোরান আর ও গীতা

তোমায় বাঁধি নিবিড় করে, তোমায় ডাকি যদি
কিসের ভয় প্রিয়
তোমায় ভালোবাসায় বাঁধি, স্বাধীনতার দাবি
কণ্ঠে তুলে নিয়ো।

তোমার শিরে উল্কি আঁকি, তোমারই শিরে লিখি
আমিও হতমান
তবুও নিরাপদেই খুঁজি স্বদেশ, প্রিয় নারী
সারাটা দিনমান।

তোমার হাতে নক্‌শা তুলি, তোমারই হাতে লিখি
সময় বড়ো কম
এখানে কিছু ভালুক থাকে ক্ষয়াটে খর্বুটে
রোখো না সংযম।

তোমার পায়ে ছন্দ রচি, তোমার পায়ে লিখি
রেখো না আর ভয়
মেপেছি আমি অন্ধকার, গুহার জটাজাল
গভীরতর নয়।

বদলে যেয়ো শিশু আমার, বদলে হোয়ো তুমি
ভিখিরিদের রুটি ;
অথবা তুমি বদলে হোয়ো রোদের তরবারি
আমার তবে ছুটি।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

শুদ্ধ কবিতার

কবিতায় গল্পবীজ ভালো
গল্পে কবিতার আসা-যাওয়া
আলো-অন্ধকার ভালো
উপন্যাসে মাঝে মাঝে কবিতার রহস্যশরীর
কিংবা প্রবন্ধেও
নাটকে সংলাপে কিংবা নাচের মুদ্রায়
চিত্রশিল্পে রঙে কিংবা রেখার মোচড়ে
কবিতার ঢুকে পড়া মূর্তিবিমূর্তিতে ভালো
শুদ্ধ কবিতায়
কবিতা থাকার কোনো মানে নেই

দেবী রায়

দুঃখিনী বর্ণমালা

কোনো এক সময় হয়তো বা পাপও থেমে যায়
কখনো থামে না সেই পাপের অন্যায় !
ভয়—কালো নিষ্ঠুর ভয় এসে গ্রাস করে তোমাকে
আমাকে, ঠা-ঠা রৌদ্রে মনে হয় পৃথিবী জুড়ে গমকে গমকে
লেলিহান বিষ শুধু উদ্গীরণ করে নিরবিচ্ছিন্ন ত্রাসে

দুঃখিনী বর্ণমালার দিন কাটে কষ্টে সৃষ্টে
না হয় নিরম্ব উপবাসে।

আশিস সান্যাল

এখন বৃষ্টির রাত

এখন বৃষ্টির রাত। চোখে নেই ঘুম।
মনে পড়ে কবেকার
সেই এক মায়াবতী রাতের নিঝুম।
ছিলে তুমি মালবিকা
স্বচ্ছ হীরার মতো অনুগত পাশে—
মৌলিক আনন্দ আর
সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল নির্মল বাতাসে।

সেদিন বিহ্বল রাত উঠেছিল কেঁপে।
দুধের মতন স্নিগ্ধ
চারদিকে জাগতিক উঠেছিল ঢেউ
আমার বুকের পাশে
অনুরত তুমি ছাড়া ছিল না তো কেউ।
অমল আবদ্ধ ঘরে
দুজনের শ্রদ্ধাময় বিখ্যাত মিলন—
চিহ্ন তার পড়ে আছে,
চারদিকে আলোড়িত দিনান্তের বন।

এখন বৃষ্টির রাত। দুর্লভ বাতাসে
বর্ণময় ইচ্ছাগুলি
কার্পাস তুলোর মতো নীলিমায় ভাসে।
মনে পড়ে কবেকার
বৃষ্টির বিজন রাতে স্পষ্ট পরিচয়।
প্রেমিকের মৃত্যু নেই—
পৃথিবীর সবখানে প্রেমিকেরই জয়।

ব রা কে র পা শে

বরাকের পাশে ছিল ছোট শালবন ;
সেদিন অনেক রাতে আমরা দু'জন
পরস্পর কাছে এসে দেখেছি আকাশে
উচ্ছল বনেদি চাঁদ নীলিমায় ভাসে।

স্বচ্ছল দেহের ভাঁজে অতিরিক্ত ঘাম,
দেখালে সলজ্জ আর দেহের তামাম
আবাদী জমিন সহ দু'টি শাদা ঢেউ—
আমি ছাড়া এর আগে দেখেনি যা কেউ।

এখনও নির্জনে আমি বরাকের পাশে
শুয়ে থাকি নিরুচ্চার স্মৃতিক্ষয় ঘাসে ;
দেখি আজ অন্তর্গত চোখের নীলিম
ঝরে যেন চারদিকে বেদনার হিম।

সব কথা মনে পড়ে সেদিনের নারী,
বড় কাছে ছিলে তুমি অদ্ভুত আনাড়ি
নির্ভার আকাশ তলে বুকে রেখে বুক—
পেয়েছিলে অনন্তের অশ্রুময় সুখ।

বরাকের পাশে ছিল প্রসিদ্ধ অমরা,
তোমার শরীরে ছিল অমৃতের ঘড়া ;
পান করে সেই মধু দু'জন দু'পাশে—
কেন সে নারীর কথা মনে ফের আসে ?

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আ জ কা ল প র শু

রোদ এসে চলে গেছে
আবার আসবে কালই
বিকেলের ভ্রমণবান্ধবী
এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
কিছু কি নতুন কথা বলবে
কী আর নতুন
সবাই পুরনো হয়ে যাচ্ছে
এক নামের গাছগাছড়া
একই খাদ্যতালিকা
শুধু চেয়ারটা এদিক থেকে ওদিক
বইগুলি নাড়াচাড়া
এভাবেই একদিন আর কিছু ছুঁতেই চাইব না
যা ছিল দারুণ প্রার্থিত
কিন্তু ফুল ফুটছে
বৃষ্টি আসবো-আসবো করছে
চিরসহচর
আজ মেঘ-মেঘ
কাল রোদের প্লাবন...

খু ব দূ রে ন য়

খুব দূরে নয় কিন্তু কাছে ত নয়ই
বিচ্ছেদ পাহাড় হয়ে যায়
বুঝি মরীচিকা
যত কাছে যাই আর যতই এগোই
কেবলই পিছিয়ে যায়
লক্ষ্যভেদ হয় না সহসা
সময়ও যে অনুরূপ

যত কাছাকাছি তত দূর
দূর কোন কারুকার্য ইতিহাসে
কিছুতেই মানা যায় না
কেন এমন
কিন্তু এরকমই
হওয়া না-হওয়া সবই
নিজের নিজের পথে চলে
চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি
স্থির জলের একান্ত কিনারে…

সুব্রত রুদ্র

ধ্যা ন

সংসারে আলো ধরেছে সূর্য ওঠার আগেই
সূচের গায়ে সুতো ওঠা-নামা করে সারারাত নক্ষত্রের ফুটপাথে

রা গ

ঝরো, কপালের ঘাম
বহুক্ষণ রাগ জমে আছে।
নতুন ক'রে লেখা হয়নি একটাও রাগী কবিতা

বেশ, লেখো, স্তব্ধ এই বাক।
তবু ওই যে আলো,
সকাল হ'লো
মৌরীগাছের মতন মাথা মাটিতে পেতে।

বাসুদেব দেব

ঈ শ্ব রে র চ লা ফে রা

কখন নিঃশব্দে খুলে যায় সদর দরজা
সামান্য হাওয়ায়, ঢুকে পড়ে একটা বেড়াল
উঁকি মারে একটি মেয়ে, গন্ধ সাবান ফিরি করে সে
উড়ে যায় একটা কাগজের কুচি, বোধহয় বাসের টিকিট
যেন সে-ও যেতে চায় কোথাও
পরিচারিকা এসে বন্ধ করে দিয়ে যায় ছিটকিনি
তার ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর, যেন এইসব ঘর-সংসার
ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখার জন্যই তার জন্ম
আমি ছুটির দুপুরে শুয়ে শুয়ে এ সব দেখি
বিছানার পাশে টেবিলে অপেক্ষা করে জলের গ্লাস
যেন তারও কিছু বলার আছে

ঠাঠা দুপুরে ক্লান্ত পিওন রাস্তার পাশে
লাল টুকটুকে চিঠির বাক্স খুলে উন্মোচন করে
একরাশ কথাবার্তা, বিষয় ও ভালোবাসার রহস্য
আমি জানালা দিয়ে দেখি
কার্নিশে অনেকক্ষণ বসে আছে গম্ভীর একটি কাক
জেলাকোর্টের উকিলের মতো
জানে রুটির টুকরো রেখে যাবে এখুনি
মেয়েলি কোন হাত, হাতে লাল রুলি
টবের ন্যাড়া গাছটার ওপর ঝুলে পড়েছে ভিজে শাড়ি
যেন কী একটা মধুর বার্তা বিনিময় হলো ওদের
আমি শুয়ে শুয়ে দেখি
খুলে রাখি চশমা, উপুড় করে রাখি বই
বুঝতে চেষ্টা করি এই সব কিছুর কোন একটা মানে

আমি দেখতে পাই ভরদুপুরে
নিজের টাকের ওপর গনগনে রোদ, কিন্তু

নিচু হয়ে ছাতা মেলে ধরেছেন বাবা
শিশুটির মাথার ওপর, সে ইস্কুল থেকে ফিরছে এখন
ল্যাম্পপোস্টের নিচে ঘুমুচ্ছে একটা বুড়ো রিক্সা
তার ছায়ায় তৃপ্ত একটা কুকুর তৈরি করছে তার বিছানা

ঈশ্বরের চলাফেরা আমি এভাবেই দেখতে পাই
আজকাল, আমি এ ভাবেই দেখতে শিখছি

অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্তী

সে ই ক থা

শেষ অগাস্টের কাছে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম
জল থেকে ফিরে যাচ্ছে রোদ

হাওয়া মেঘ উটকো অভ্যেসের মত ঘিরে ফেলল ঋতু

যদি অবসরমতই এলে সুরকি ও সিমেন্টের আওয়াজ এড়িয়ে
যদি এলে…

আমাদের একটি দিনকেও কিন্তু
গথিক গাঁথুনি বলে মনেই হবে না
টলটলে জলের মত মেছো-গন্ধে ভরে আছে ঘর

তোমাকে বিতর্কে টেনে লাভ নেই
আমাদের বাসস্থান ঘর নয়, বনও নয়, যে,
চমকে চনমনে মুখ আমি ঘোলাটে পাঁজরে টেনে
বলতে পারি সেই কথা—সে-ই মারাত্মক কথা

যা মি নী রা য়ে র ছ বি

লজ্জারঙ ছিটিয়েছে রোদ
যামিনী রায়ের আঁকা পটাকৃতি ছবির ওপর, ফিসফাস
কথা বলে কেউ—কথা বলে ছবিরা যখন
আমাদের বোধে নামে ঢল, ঐকতানে
দু টুকরো হৃদয় বসে মুখোমুখি
আলোকবর্ষের মত
জীবনের তন্তুগুলো দীর্ঘতর অনন্তকে ছোঁয়।

দময়ন্তী গুপ্ত উইক্ল্যাণ্ডার

প সা রী ফে রে ঘ রে

কখনও সে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে,
কখনও সে নূপুর পায়ে যায়,
চোঙাতে হেঁকে বলে "বুলবুল ভাজা
খেতে লাগে বড়ই মজা।"
সে ঘরে ফেরে
যখন ঈশান কোণে মেঘ ঘনায়।
তার রাস্তা ফুরায়। নীরবে
ঘরের দরজায় সে দাঁড়ায়
আলো নিয়ে
আঁধারের আড়ালে তার ঘরণী
তাকে নিয়ে যায় ঘরে।
আসন দেয়, পা দেয় চুল দিয়ে মুছিয়ে
অশ্রু দিয়ে ধুয়ে।
হঠাৎ তারা দেখতে পায় দুজনে
ঈষাণ কোনে তাঁর শুভ ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত
ভয়ে আনন্দে তাঁর দিকে তাকায় অপলক।
শিহর লাগে যুগল সত্তায়।

ডু ং রি র মো ড়ে

ডুংরির মোড়ে ট্রাফিক সিগনালে গাড়ী দাঁড়িয়েছে। দেখি দুই হাতে জুতো বেঁধে রাস্তায় ঘষে ঘষে এক সাঁওতাল বৃদ্ধা রাস্তা পার হচ্ছে। হঠাৎ আমাকে দেখে সে বলে উঠল "বাবুলি! বাবুলি তোকে কত পরিষ্কার দেখতে হয়েছে।" তার ডাক শুনতে পেলাম, গাড়ী ছেড়ে দিল, অনেক দূর থেকে তার ডাক আমাকে ডেকে নিয়ে গেল আরও অনেক দূরে, অতীতে শাল মহুয়ার প্রাকার আলো করে সেখানে উঠেছে স্মৃতির পূর্ণিমা চাঁদ সাঁওতাল নাচের আসরে।

তখন শিশু বয়স আমার। সাঁওতাল যুবতীদের সঙ্গে কোমর জড়াজড়ি করে তালে তালে নেচে চলেছি। মনের ভেতর মাদল, শরীরে নাচের ঢেউ। চোখের

সামনে দুলে উঠছে সাঁওতালের মাথার পালক। আর খোঁপার পলাশ ফুল। সাঁওতাল দাই আমার নিয়ে গেছে আমাকে তাদের নাচের আসরে। রূপকথার রাজকন্যার মত সেই দাই স্বর্গের মহুয়া ফল যেন কুড়িয়ে রেখেছে কোঁচড়ে। পূর্ণিমা চাঁদের আলোয় মাখিয়ে সেই মহুয়া ফল সে দিচ্ছে আমার মুখে নাচের অবসরে, নিজেরা খাচ্ছে হাঁড়িয়া। শিশু বয়সের মহালগ্নে চেনা হল তার সঙ্গে আমার নাচের আসরে সে এক নতুন চেনা, সে দাই নয়, রাজকন্যা। আজ সে রাস্তা থেকে ডাক দিল ট্রাফিক সিগনালে, আমার গাড়ী চলছে তাকে পেরিয়ে, কিন্তু মন রয়েছে তাকে জড়িয়ে। সে চেনা দিল আবার আর এক মহালগ্নে, জীবনের গদ্যে আর ব্যস্ততায় যে কবিতা হারিয়ে গিয়েছিল তাকে ধুলো ছেড়ে দেখলে সাঁওতাল যে বৃদ্ধা সে চির নবীনা।

ব ন্দী ক বি তা হ বে ই স্টা রে র লি লি

পৃথিবীর মাটির উপরে আমি বিরহী। আঙুর ক্ষেতে নির্বাসিত। মাটির নিচে যেন ব্যাষ্টিয়নে বন্দী কবিতা আর ওমর খৈয়াম।

স্বর্গ থেকে বৃষ্টি ঝরে, আমার পৃথিবী আর পাতাল স্নিগ্ধ হয়, আকাশ পাতালে মিলন হয়। বিরহী আমি দেখি সেই মিলন। দেখে সুখী হই যদিও বিরহী আমি আমার কবিতা আর ওমর খৈয়ামের বিরহে। একদিন কবিতা আর ওমর খৈয়াম পাতালের ব্যাষ্টিয়ন থেকে ছাড়া পাবে, স্বাধীন হবে, একথাই বলছে স্বর্গ।

স্বর্গ কবিতাই রচনা করে আকাশে মর্ত্যে পাতালে। যারা সে কবিতা পড়ার সময় খোঁজে না, তারা সে কবিতা ছিঁড়ে ফেলার সময় খোঁজে, সময় খোঁজে সকলের চোখে ধুলা দিয়ে কবিতাকে গুম করার। স্বর্গের রচনা কবিতাকে এখন তারা বন্দী করেছে পাতালে। শেষে কী বন্দীদশা ঘোচাতে কবিতা আর ওমর খৈয়াম একদিন পুঞ্জ-আলোর মেঘ হয়ে উঠে আসবে পাতাল থেকে, চলে যাবে স্বর্গে, বিকশিত হবে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে ইস্টারের লিলির মত?

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

নি র্বা ক

কিছু তো বলার নেই, তাই
পাখিদের সযত্নে এড়াই।

ভুলেছি যেহেতু কথাকলি
দেখে চলি পাংশু মুখগুলি।

কে নিল লোহিতকণা, প্রভু
মৃতপ্রায়, ক্রোধ জাগে তবু।

কেন ওরা ? কেন ওরা ? কেন ?
প্রশ্ন আসে, তুমি কাউকে চেনো !

চিনিনা, জানিনা, শুধু বুঝি
চলেছি ওদের ভূমি খুঁজি

যেখানে অসীম শস্য সোনা
রেশম অসংখ্য তাঁতে বোনা

আর আছে সকলের কাজ
আগুনে পুড়েছে ভুরু ভাঁজ

এক বা দুইয়ের কিংবা তিন
সম্মিলিত শাসন কঠিন

ভুলেছি যদিও সব ভাষা
মুমূর্ষু, জারিত তবু আশা

নির্বাক, একাকী হাঁটি তাই
আলাপন সম্ভ্রমে এড়াই।

জয়ন্তী রায়

বৃ ষ্টি জ লে এ ক দি ন

এই যে গার্হস্থ্যে ভরো
দিনরাত সকাল বিকেল,
এর কোন মানে আছে কিছু ?
বেঁচে আছি ব'লে শুধু
এত কোলাহল ?

অশ্রু লবণ আনে
সমুদ্রের পরুষ বিক্রম,
বেঁচে থাকা মানে শুধু বিক্রম,
জোর ক'রে কেড়ে নেওয়া
হৃদয়ের অস্থি মজ্জা মাংসের
স্থিতিস্থাপকতা,
বেঁচে থাকা মানে শুধু
নত ক'রে আনা
বৃক্ষের মহৎ সঞ্চার—
মানিনা একথা আমি,
এ জীবন শুধু মাত্র মাংসের চীৎকার :
টুকরো ক'রে ভেঙে
তবে কি বুঝতে হবে
এ পৃথিবী একদিন
অটুট অখণ্ড হয়েছিল—
পায়ের তলার খর ঘাস
জেদ নিয়ে বসে থাকে,
বৃষ্টি জল একদিন
মসৃণ দূর্বো হবে বলে

প্রদীপচন্দ্র বসু

আ ত তা য়ী

টুরিস্ট লজের শিউলি গাছে ফিরে এল চড়াইয়ের দল
আর, একই সঙ্গে ঝিমিয়ে গেল দিনের আলো,
গ্রীষ্মের বাতাস মেলার মাঠ থেকে মোরামের রাস্তায় নেমে
ঘূরপাক খেয়ে উঠে যায় আকাশের দিকে—
পাতা ওড়ে, ধুলো ওড়ে,
কুঁড়েঘরের দাওয়ায় উনোন থেকে ধোঁয়া ওড়ে,
বাতাস ক্রমশ ভারী হয়।
নীল আকাশ কালো হবার আগে
প্রান্তিক থেকে উড়ে আসে মেঘ,
তাল গাছের মাথায় খেলে ঝড়ের বিদ্যুৎ ;
আর একবার ভাললাগা আমাদের
টেনে নিয়ে গেল খোয়াইয়ের খাদে,
যেখানে ক্যানেলের জলে ঝুঁকে থাকে ইউক্যালিপটাস
শান্তিনিকেতনে
এরকম সন্ধ্যায় দিন শেষ হয়ে গেলে মনে হয়,
আমাদের দিন কখনো হবে না শেষ,
সূর্য ডুবে গেল অন্য এক আলো
আমাদের দেখিয়ে দেয় ওপারে যাবার সাঁকো।

আজ কোন স্মৃতি নেই, মনে পড়ে না পুরোনো দিনের কথা
জানি, যা কিছু মৃত তার থেকে জন্ম নেয় স্মৃতি
জীবন অন্তহীন, বেঁচে আছি
প্রতিদিন, আমাদের দিন—
ক্যানেলের পাড়ে বসে জলের সারল্য নিয়ে
আমরা জলকে দেখি,
শব্দ শুনি, পাতা ঝরে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায় দূরে।

সে সময় অন্ধকারে চুপিচুপি কেউ আসে
আমি ভাবি, তার হাতে ধরা আছে ছুরি
যা আসলে শীতের গোলাপ।

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

শ্বে ত ব নে তে ব ন বা সে থা কি, যে ম ন ছি লে ন যা জ্ঞ সে নী

পঞ্চপুরুষ সঙ্গে নিইনি
আমি একা থাকি পুরুষবিহীন
ভাবতেও তুমি পারতে না বুঝি যাজ্ঞসেনী
ব্যাসদেব তুমি আমাকে চেনোনি
একা আমি তবু একা একা নই
আছে গাছপালা আছে মেঘরোদ
আছে বনবাসী মানুষজনেরা
বিশ্বপ্রকৃতি সঙ্গেই আছে
আছে দু একটি রাক্ষস ও কিন্নর
আছে এইসব ভূলোকবাসীরা
ভালোবাসি এই বন ও বনান্তর
মহাভারতের নায়িকা নয়কো
নইকো পঞ্চপতির রমণী
একা আমি এক জটিল রমণী
একা আমি তবু একা একা নই
আমাতে কি তুমি চিনেছিলে কভু
যাজ্ঞসেনী

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

অ ন ন্ত টে নি স

[স্টেফিগ্রাফকে]

সকালবেলার পৃথিবী
টেনিস বলের মত ফুরফুরে
নিজস্ব কক্ষপথে ছিটকে যায়—
এইভাবে
ভূমণ্ডল হালকা টেনিস বল হয়ে
উড়ে যাচ্ছে আকাশে।
দিগ্বলয়ে আলো ফুটছে
অন্ধকারে শব্দহীন ঠুকঠাক শব্দে
কেটে যাচ্ছে দিন…রাত্রি… যুগ…

শিরিষপাতায় রোদ
ঝরঝর ঝরঝর করে
কেটে যায় আয়েসী দুপুর।

খুকি, তোর ক্লান্তি নেই এতটুকু,
সাতসকালে দৌড়েছিস দুধ ফেলে,
দস্যি তুই দুপুরে না শুয়ে
অক্লান্ত সুঠাম পায়ে পেখম নাচিয়ে
ছুট্‌ছুট্‌
টেনিসের অনন্ত চত্বরে।

সুদেব সাহা

উ জ্জ্ব ল হ য়ে থা কে

শাপলা ফুলের পুকুরে
কখনও কখনও
সকলের অজান্তে
পদ্মফুল ফোটে।
একই পুকুরে জল হাওয়া পেয়ে
দু'জাতের ফুল
কিভাবে জন্ম দেয় কে জানে?
শহর নগর অথবা গ্রামে
বাড়ি-ঘর সবই মনে হয় এক
আকাশ থেকে,
তারই মাঝে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
কোন একটি বাড়ি
ক্ষণজন্মা যদি জন্মে কেউ।
রাস্তাঘাট পরিচিতি পায় তার নামে
কেমন সে দেশ
কি তার পরিচয়
তুচ্ছ হয়ে যায়
এভাবেই জন্ম নিয়েছে সূর্য্য
দিনের আকাশ,
রাতে চাঁদ—
উজ্জ্বল হয়ে থাকে
তারাদের মাঝে।

দীপ সাউ

ক ফি হা উ স

চিরকাল আলো জ্বলে কখন কখন লোডশেডিং
যুবতী, তরুণী, ব্যর্থ কবি সব বসে থাকে টেবিলে টেবিলে।
শরীরের ভেতরে যেমন অন্ধকার গোটা কফি-হাউসে ছড়িয়ে যায়।
গুজ গুজ কথা ওঠে কানে হাসি দু ঠোঁটে রণন—
কার কথা শোন?
আর কোণে কোণে সিগারেটের আগুন জোনাকির মত জ্বলে আরো জ্বলে,
কমে।
বোবা চোখ দেখে—বোবা মন দেখে—বেয়ারাকে ডাকি,
সাদা পোষাকের অবয়ব ঘোরে ফেরে।
বলি আলো চাই সে জিজ্ঞেস করে—আলো?
চারদিকে কয়েকটা জোনাকি জ্বলে কেবল জ্বলে।

ল ব ণ - আ ন্দো ল ন

সমুদ্রের ধারে সমস্ত দিন নুন বানাই—রোদে ছায়া বড় থেকে ক্রমে ছোট
হয়ে আবার বড় হয়। গভীর রোদে সমুদ্রের জল কাঁপে
আর টি টি তীব্র ডাকে।
কুড়ে ঘরে তার পা থেকে চাঁদ ভেঙে আনা টুকরোর মত
কপালে জিভ ঘসে আত্মজীবনী বানাই।
সমুদ্রের ডাক কুড়ে ঘরে উজিয়ে আসে।
সমুদ্রের নুন নারীদেহ উজিয়ে আসে।
সমুদ্র ভোলে না একদিন জন্ম দিয়েছিল তার শরীর।

পলাশ বর্মণ

নি শি ও তা র শ য্যা স ঙ্গি নী

সারাবেলার ক্লান্তি মুছে শুয়ে আছে সঙ্গিনী তার
ঘুম আসেনি,
ঘুম আসেনা, মেঘলা আকাশ, মনটা খারাপ
ভাবনা অনেক, ভাবনা জাগায় বুকের ওপর ঘাসের ফুলই
ঘাসের ফুলই ছেলের ছলে গন্ধ খোঁজায়—
বন্ধ চোখের কল্পলোকে জন্ম দেবার ইচ্ছে ফোটে!
কিন্তু, সে যে দারুণ একা—নিঃসঙ্গতায় অন্তরীন
মনটা খারাপ, চিন্তা খেলায় চোখটা বোজে
ঠিক তখনি,
একটা শরীর এগিয়ে আসে অশ্বেতকায়;
পাগলা বটের জটায় চেপে, বাবলা বনের ওপার থেকে
একটা শরীর এগিয়ে এসে আদর মাখায়।
সঙ্গিনীরই শান্তমুখে, দীঘির ওপর
ভরিয়ে তোলে সংখ্যাবিহীন চুম্বনে;
সঙ্গিনীটার বুকের 'পরে এক বিজনে
এমনি ক'রেই নিশি নামে।
হাতের ভেতর মনের ভেতর
বন্দি ক'রেই সঙ্গমে
শান্তি-নীড়ের স্বপ্ন দেখে সঙ্গিনী তার:
এই সু-যোগে
তৃতীয়া তিথির চাঁদ উঁকি দেয় কাশ বাগানের অঙ্গনে।

অনুপ কুমার দত্ত

প্র ভু ন গ্ন ক রো না

নগ্ন নির্যাতি কিংবা পোষাক পরিহিত
এমন দুটোকেই পাবে মঞ্চের গৌরবে
কেননা পোষাক খুলতে গেলেই
নগ্ন হয়ে যাই

প্রভু নগ্ন করো না জনসমক্ষে
প্রভু পোষাক পাইও না কারাগারে
কৃষ্ণ জন্মাবে বলে
বেশ কয়েকটি রাত অপেক্ষায়

রাতের তারাগুলো মিটমিটিয়ে হাসছে
রাতের মজলিসে ভেরোনিকা নাবছে
আমরা ভাসছি ফেনার বুদবুদে
নকল বুঁদির গড় কবে গেছে ভেঙে।

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

শী ত

এক লাজুক কিশোর দরজাটা এতটুকু ফাঁক করে
অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে—ভেতরের উদ্দাম মাইফেল
নানা রঙের মদের ফোয়ারা
মেয়েমানুষের লাস্য
আর বাদাম ভাঙার শব্দ
মাঝে মাঝেই শাড়ির আঁচল খসে পড়ছে
দশটা মাতালের অবাধ্য দৃষ্টি চলে যাচ্ছে
সেই উত্তেজক বিভাজিকার দিকে
আর তখনো পাড়গেঁয়ে লাজুক কিশোর
থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—দরজার বাইরে।

পড়ি পড়ি করেও এবার এবার এশহরে শীত পড়লো না এখনো।

স্মৃতপা ভট্টাচার্য

ম্যা জি ক

এই-ই ভালো। পায়ের তলা থেকে মাটি
বিলকুল সরে না গেলে
কী করে শিখবে, শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকার ম্যাজিক ?

আর যাকে ভেবেছিলে আলো
আসলে যা ছিল—
অন্ধকারের ঢেউ-এর চূড়োয় ফসফরাস
সাপের মতো সুন্দর আর সাপের মতোই খল

সেই আলোকে ধরতে চেয়ে হাতের মুঠোয়
তোমার ধমনীগুলোও নীল হয়ে গেছে কবে !

এও কি এক ম্যাজিক নয়—ষ্টিল-নীল শরীরটাও
খায় দায় ঘর করে দিব্যি হেসে খেলে ?

ম্যা জি ক ২

সুন্দরী যুবতীটিকে পোরা হলো কাঠের বাক্সয়।

মনে রাখবেন, যাকে পোরা হয়
সব সময়ই সে যুবতী এবং
প্রসাধনে শোভনা সুন্দরী।

বাক্স দু টুকরো হলো, তারপর
যুবতীটি বার হয়ে এলো অবিকল !

এ খেলা তো আপনার চেনা, দেখা।
আপনি জানেন না তবু, সুন্দরী যুবতী যে
আপনাকে হাসিমুখে আপ্যায়ন জানালো পার্টিতে

তারও শরীরখানি তরোয়ালে টুকরো হয়ে আছে !

কণা বসুমিশ্র

মৃ ত্যু র সা না ই

কাল সেই তারিখ
কারো বা জন্মদিন
কারো বা মরণ—

বিয়ের সানাই নয়,
এ যে মৃত্যুবাণ
শিরে বয়ে নিয়ে
আসে ; বিংশতি যুবতী।

শনিবারের বারবেলায়
কালো পাড় হলুদ
খোল শাড়ির আঁচলে,
অশুভে রঙের ছায়া—

ঘোর রাহুতে, স্বপ্নের
পিঁড়িতে বসে ছাদনাতলায়,
অথবা ম্যারেজ রেজিস্টারের
লালপেন্সিলে

নির্মল বসাক

বি প দে র স ঙ্গে

বেশ কিছুদিন বিপদের মধ্য দিয়ে চলছিলাম।
ঠিক আমার বিপদ নয়, বিপদের সঙ্গী হয়েছিলাম।
ডাইনে মোড়, বাঁয়ে মোড়, কতো জিগ্‌জাগ,
কতো হেয়ার-পিন বেন্ড ;
অন্য সময় হলে বলতাম, কই, তুমিও সঙ্গে চলো!

অবশেষে সমতলে পৌঁছলে, বিপদ নেমে যেতে যেতে
জিগ্যেস করলো, আত্মহত্যার তারিখ কতো?
বললাম, আমার না তোমার?
যদি আমার হয়—যেদিন প্রথম কদমফুল ফুটেছিলো।
আর যদি তোমার হয়—সম্ভবত আজ ;
কবিতা লেখা ছেড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম,
তুমি পেছন চেপে বসলে!

পার্থসারথি চৌধুরী

আ ব হ কা লী ন

ভূরিশ্রেষ্ঠে অবসন্ন নদীর কিনারে
যজ্ঞিডুমুরের ফলে ঝুলে আছে বাঙালির নিজস্ব জীবন।
পাতার কর্কশে কিছু বিস্মৃত পৌরুষ
কর্দমচারিণী জলে রূপবতী ললনার সীধু

ভাঙা দেউলের পাশে মৃদু আলো সংকেত ভাসায়,
উদগ্র আসঙ্গরাত্রি বিষয়ের রক্ত করে পান।
হাবাগোবা শশা ও তরমুজে
বিফল প্রজন্ম রচে অনুকারী নাগর বিভ্রম।
জড়ো করে মটকায় বছরের চাল,
চূণের ফোঁটায় শুদ্ধ কুমড়ো ও লাউ।

মাথার ভিতরে ঘোরে সঞ্চয়ের গুপ্ত বীজাধার।
শতাব্দী গড়িয়ে চলে, জনযাত্রা ক্রমে কিমাকার।

মঞ্জুভাষ মিত্র
দর্শনার শরীর ৩১

সে ছিল গায়িকা, তার অনবদ্য কন্ঠস্বর দ্বারা সে আমার উপর কুহক বিস্তার করেছিল। তার স্বরের তীব্র মধুর আরোহণ এবং মৃদু স্নিগ্ধ অবরোহণ আমাকে মাতাল করে দিল পরপর বেশ কয়েকটি নভেম্বর মাস। এই সময় নিষ্পত্র বৃক্ষে গুচ্ছ-গুচ্ছ অম্লস্বাদযুক্ত ফল দেখা যেত, সে ফল যারা কুড়াতে আসত বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকা আমার দিবাস্বপ্নময় চক্ষু ও স্নায়ুমন্ডলীর উপর তাদের ছবি আঁকা হয়ে যেত। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করতাম, এই মায়াবী সময়ের শৈল্পিক আবেদনকে চিরদিনের মত ধরে রাখতে পারবো না। রোদের ভিতর দিয়ে রঙ্গীনা মাটির পথে ঘন সবুজ বৃক্ষ লতাগুল্ম এবং বিরল গৃহরাজির ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে বহু দূরে চলে যেতাম এবং ফিরে আসতাম। আহা আমার দেহমাংসের স্তরে স্তরে অনুসন্ধান করলে সেই সব দৃশ্যাবলী ও অনুভূতি, স্বাদ এবং গন্ধ সম্ভবত পাওয়া যাবে। সৌন্দর্য এবং তৎসম্পৃক্ত আগ্রহ এ সময় আমাকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করে রেখেছিল। ভেবেছিলাম মধ্যরাতে সেই মেয়েটি পা টিপে টিপে আমার ঘরে প্রবেশ করবে; কিন্তু সে এখন একটা বাড়ীতে আমার সঙ্গে বসবাস করছে। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল একটি অল্পবয়সী মেয়েকে পিচ্ছিল পতনের শেষ সীমায় নিয়ে যাব আর আলোচ্য মেয়েটি আমাকে শিল্পশাস্ত্র ঘটিত সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। ফুল তোলার উৎসব হবে নারী ফুল বাগানে, হে আত্মউন্নয়নকামী ধীরভাবে পা ফেলে এইখানে এস। মধুরঙ্গা ফুলের বিশাল গন্ধ ভুবন ছেয়ে ফেলল। সে আমার আশাপূরণ করেছে, আমার বিছানায় এসে স্বেচ্ছাক্রমে শুয়ে পড়েছে; আমার বিষাদ কেটে যাচ্ছে, এই গৃহ আবার বাসযোগ্য হয়ে উঠল। আমি আমার স্বপ্নগুলিকে পুনরায় জাগিয়ে তুললাম, দৈনন্দিন একঘেয়ে কাজকর্মের বাইরে যেতে হবে। শিল্পকলা এবং কল্পনার পটভূমিকায় আমার প্রেমিকাকে স্থাপন করেছি। 'রসিক-প্রিয়া' নামক নূতন নগরীর নাচঘরে আজ আমাদের আমন্ত্রণ, পাশের ঘরে উদ্দিষ্টা নারীর রেশমী পেটিকোটের খসখস শুনতে পাচ্ছি, হেমন্তকালীন পাতা ঝরার মত মোলায়েম এবং বিলাসবহুল। আমি ভাবছি আমার গোপন জীবনের মধ্যে সে কোন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করল। যে সব মুক্তা, ঝিনুক, রঙ্গীন বৃক্ষপত্র এবং দামী চিত্র সংগ্রহ করেছি আমার ব্যক্তিগত লুকোনো ঘরের সবকিছুই সে উপভোগ করবে। তথাপি মুহূর্তের জন্য আমার মনে কোন ধাক্কা লাগে নি, নিরপেক্ষভাবে কাজ করার শক্তি হারাই নি পাতার পর পাতা বই পড়ে গেছি অথবা লিখেছি। অথচ অন্য কেউ এলে আমার এই ক্ষমতা থাকে না। শুধু এইজন্য আমি আমার জীবনকে পরপর সাতটি বৃহৎ দেওয়াল অথবা পর্দার স্তরের ভিতর রেখেছি, কোনো উদ্ভিন্ন কোমল বৃক্ষ অথবা কুঁড়ির মত। পরতের পর পরত ভাঁজ ঠেলে আমার ভিতরের শুদ্ধ সত্তার কাছে একমাত্র সেই আসবে যে নারী আমার তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম। অথচ বাইরের নানা ধ্বনি, গাছপালা, মোটরগাড়ী, মানুষজনের আসাযাওয়া সম্বন্ধেও আমি খুব একটা উদাসীন নই। এই তো সেদিন মালা-উদ্যান অথবা গ্রন্থাগারে গিয়েছিলাম, ভারী ওভারকোটে গা ঢেকে পোর্টিকোর ধারে একটা নরম গায় কোচের উপর বসেছিলাম; আমার হাতে বই। বই পড়তে পড়তে অনুভব করলাম আমার ঠিক বিপরীত দিকে কোথাও একটি অদৃশ্য গোলাপ আছে। এইভাবে মোট ছয়ঘন্টা ছিলাম। এতএব আমি যে আনন্দ ভালোবাসি তা কামনাপূর্ণ এবং রহস্যময়, তা নির্জন নয়, তা খন্ড এবং চিরপলাতক। মধু গ্রামের সাগরতীরে আমি শেষ বারের মত তাকে অন্বেষণ করতে গিয়েছিলাম। মধুগ্রামের সাগরতীরে সংগীতের নীল ঝঙ্কার ও জলরাশির প্রবল সৌন্দর্য আমি চিরদিন স্মরণ রাখব। জ্যোৎস্নারাতে আমার উদ্গত মিলনপিপাসা ঢেউদের শাশ্বত ফেনার কুসুমরাশির উপর ভ্রমরবৎ ভ্রমণ করে; ছাদের উপর অবলুণ্ঠিত রাত্রি-রহস্য এবং জানলা খুললেই সমুদ্র দেখা যায় তার ভাষা যেন বিছানার উপর আছড়ে পড়ে। প্রচন্ড ঝড় এল কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী, দিবাভাগে আমার বিশ্রাম কক্ষটিকে মনে হল জাহাজের কেবিনের মত; ঘোলা কাঁচে বিচ্ছেদবেদনা ও মৃত্যুর কোমল ব্যঞ্জনা, স্মৃতির বিষণ্ন একঘেয়ে গুঞ্জরণ। ঘুমিয়ে পড়ার আগে ভেবেছিলাম দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণনারীর সন্ধানে যাব। রাঙা টুকটুকে ফলের মতন সূর্য, অন্তত একমাইল দূরে সরে যাওয়া জলরেখা, সুইমিং কস্টিউম পরা এক বৃহৎদেহা নায়িকার রভসউল্লাস এবং ঝিনুক কুড়ানোর উৎসব সব কিছুই বেশ অর্থবহ। মাটির উপর পায়ের ছাপ পড়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাই তটরেখা ধরে, তীর ভূমির বৃক্ষদল মৃদুস্বরে কথা বলে। আমি শুভ সরস্বতীর আবাসভূমি

বলে কথিত এক দৈবশঙ্খের অনুসন্ধান করছি। রুপালি রঙের মৎস্য সম্ভার ইন্দ্রিয়কে আকুলিত করে, অতি স্বল্পবসনা জলমেয়েরা প্রলোভন-সূচক, নৌকাগুলি নারীঅঙ্গের তাৎপর্য বহন করে। তথাপি ফিরে আসতে হয়েছিল। দুপুরবেলা কয়েকঘন্টাব্যাপী ট্রেন ও বাসযাত্রার পর পুনশ্চ স্বগৃহে স্থিত হয়েছি; মাংস ও মদ্যসহযোগে আহার বেশ জমে উঠল, ক্রীতদাসী সতত সেবাপরায়ণা আর বিকালেই দরজায় তালা পড়ল দীর্ঘ দু-মাসের মত। আমি অবশেষে ছুটি পেয়েছি। রাত্রিবেলা ইস্পাত বর্ণ রেলগাড়ীতে চলার তালে তালে শুনতে পাচ্ছি ভবিষ্যতের দূরঝঙ্কার, আকস্মিক নারীস্পর্শে আমার সম্বিত যেন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে। এরপর থেকে আমার কাজকর্ম ভাবভালোবাসা সবকিছুই এক অলস যাদুকরী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

আরো কিছু মৃত্যুর খবর এলো

আরো কিছু মৃত্যুর খবর এলো
আরো-আরো মৃত্যু
একদিন এই পৃথিবীতে কেউ আমার পরিচিত
থাকবে না
আমিও থাকবো না

আমি ছিলুম আমরা ছিলুম।

সেই অনেক—অনেকদিন আগে জানলা খুললেই
চোখে পড়তো পৃথিবীর আশ্চর্য জলের ট্যাঙ্ক
নিচে একদিন দেখলুম চোখ বন্ধ করে
শুয়ে আছেন
তারপর সেই দৃশ্য আর দেখিনা
জলের ট্যাঙ্ক এখনো আছে

নেই কেন সেই মুখ নেই কেন?

আসলে সবাই এইভাবে চলে যায়
ঝগড়া, স্ত্রীর সঙ্গে মন কষাকষি
বন্ধুর ষড়যন্ত্র
সব সরে যাচ্ছে কতো-কতো স্মৃতি
মৃত্যুর ভেতর থাকতে-থাকতে কখন যে
আমরা
মৃত্যু পেরিয়ে চলে যাই অমৃত বিশ্বে।

সুভদ্রা ভট্টাচার্য

র ং বা হা রে খে ল না

ছোটবেলায় কিনেছিলাম একটা রং বাহারের খেলনা
বাবা বলেছিলেন, বাবুন শিখে নাও কেমন করে ঘোরাতে হয়
মনে আছে সারাদিন ধরে ঘুরিয়ে
হাতের তালুটা ব্যথা হয়ে যেতো
সেকেণ্ডে, সেকেণ্ডে ছুটে আসতো এক একটা রং

আমার চোখ এখন উত্তরের ঘুলঘুলিতে
পুরনো রং বাহারের খেলনাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি
ঘোরাতে গেলেও পারি না
এক একদিন ভাবি বাবাকে ডাকবো প্ল্যানচেটে
শিখে নেবো কেমন করে ঘোরাতে হয়
আর অসময়ের আতাফলের নোনতা স্বাদের মতো
ছুটে আসবে অনেক রং
হয়তো সেই রংগুলো আমার আর ভালো লাগবে না

তবুও রং বাহারের খেলনাটা আমি ঘোরাতে চাই

বিজয়কুমার দত্ত

অ ভে দ

সময় আস্তে আস্তে পর হয়ে যাচ্ছে,
হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে জানার বাইরে
খুব জোরে ছুটে যাওয়ার নাগাল বেরিয়ে
চলে যাচ্ছে অনেক দূরে—

ঠিক যেমন নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে দূরে সরে গেছে
চেনা মানুষ, বন্ধু-সুজন, প্রেমিকার মুখ ও মুখোস—
সবজান্তা সংসারীর ভূমিকায় আপনারা হয়ত'
কেউ কেউ বলে উঠবেন, "এতো জানা কথা-ই
চিরদিন কি একভাবে চলে? শুরুর পরে
শেষ তো হবে-ই। জীবনের সাজানো মঞ্চে
একদিন যবনিকা উঠেছিল।
হাজার পাওয়ারের ফ্লাডলাইটের আলোয়
ঝলমলে ষ্টেজক্র্যাফ্‌টে দৃশ্যপট, সংলাপ,
ড্রামাটিক মুহূর্ত—সে এক নিরুপম বিভাব ও বিভব
এবার যবনিকা পতনের বেলা।
নিজের জীবনকেও নির্বাক দর্শকের চোখে
মাঝে মাঝে দেখতে হয়, জানতে হয়—
তখন জানা হয়, সময় কোনোকালেই ছিল না আপন
সুতরাং, পর হবে সে, কেমন করে?"

আমি এসব কথা থেকে থেকে ভাবি
মাঝরাতে ঘুমভাঙা অস্থিরতায়
মনের মধ্যে খট্‌কা জাগে,—তবে কি
চেনা ও ঘনিষ্ঠ মানুষ, বন্ধু-প্রেমিকা, কেউই কখনো
আপন ছিল না, সুতরাং তাদের
দূরে কাছে থাকা ও না-থাকার
ভেদাভেদ নেই!

দেবদাস আচার্য

ভা লো বা সা র জ ন্যে

কাঁদে ছোটো ছোটো পাতা, খড়কুটো, কাগজ-পত্তর
উসর বাতাসে উড়ে,—মেঘ দাও আর্দ্রতা দাও।
মানবীর গ্রবা ছুঁয়ে হাওয়া ও শিশির, শান্ত মেধা
নেমে এলে কট্টর তাত্ত্বিকও ছুটে যায় বনে,
ঐখানে ছায়া আছে, বিশ্রামের বটতলা আছে।

সন্ন্যাসী, পন্ডিত, কবি, কিম্বা মন্ত্রী মহোদয়, জজ
কিছুই চাইনা আর, ভালোবাসা, ভালোবাসা দাও
বলে ভিক্ষুকের মতো গোপনে আনত-জানু হয়ে
আপন আত্মার কাছে কিছুক্ষণ ও নীরবে কেঁদেছে।

পাহাড়ের ভালোবাসা থেকে ছিন্ন হয়ে ঝর্ণা কাঁদে,
তারকাসকলও কাঁদে পরস্পর দূরত্বের হেতু,
কাঁদে ঘাস, মাটি, কাঁদে মন্দির ভাস্কর্য, ছেঁড়া পুঁথি,
কাঁদতে কাঁদতে হেঁটে যান মহাকাশে সপ্তর্ষি মন্ডল।
সমস্ত ভুবন জুড়ে একাকী আত্মার কান্না ঝরে।

অজয় নাগ

তু মি জা নো

পাথর ভেদ করে উঠেছে এক যমের অরুচি
সময়ের ছুরি পালক ছাড়িয়ে
বারংবার ছুঁড়ে দেয় দিনের আলোয়
ঘুম থেকে জেগে পিঙ্গল রং তেড়ে আসে
ব্যর্থ আগুনের পতাকা নিয়ে
কোমর ঝাঁকিয়ে

বাপ্‌রে! কী তেজ

লাস্যময়ী রেশমি ফাঁস উৎসবে নির্জনে
আলোর আড়াল দিয়ে
রাস্তার দু-ধারে
স্বপ্নের কাঙাল টুপি খোলে টুপি পড়ে
যার মাথায় মাথা নেই
পায়ের তলার মাটির আকাশ মেঘের থেকে নেমে
অবোধ দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে গোলাকার অংক
পায়ে পায়ে ঘোরে

অন্ধকার পেরিয়ে আলোর অন্ধকারে
জন্মের গভীরে
কুকুরের ছায়া থেকে উঠে দাঁড়ায় নীল মদন
দু-পাশে দুই চামচে
হাতে স্টেনগান
গলায় যোনিচিহ্ন দোলে

আমার চোখের সামনে
মড়া সাপ রাস্তার মতো
আমার পিছনে নিঃশব্দে
আমাকে ঘিরে পাক খায়....
তারই একটা দিক পেরিয়ে ছোটে সোজা

আমি ভেবেছিলাম দক্ষিণ
আজ সে পশ্চিম হয়ে ঘাড়ে চেপে বসে
হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়
কোমরের বেল্ট ছিন্ন ?

দরোজাগুলি উবে গেছে প্রবেশ-পথ সমেত
নিজেকে পুড়িয়ে শেষ করা যাচ্ছে না
ওই দেখ পাপোষও জাসি পাল্টিয়ে
কার্পেট-দেমাকে বাতি জ্বালে
মানবজাতির কপালে

তুমি বিজ্ঞ
তুমি মূল শব্দের নীরবতা জানো
তুমি জানো না চালু রাস্তা
তোমার পায়ের তলায় অন্য পা নেই
নিয়মের পাশাপাশি সৌখিন নিয়ম জানা নেই
ডানাযুক্ত সাদা কল্পনা তুমি
তুমিই জানো কোথায় নিশ্চিত জাহান্নাম—
যমের দক্ষিণ দ্বার

কৃষ্ণা বসু

ভ্রূ ণ হ ত্যা র দে শে এ সে ছি

ভ্রূণহত্যার দেশে এসেছি হঠাৎ,
শিশু কন্যা ভ্রূণগুলি খুন হয় নিখুঁত আঙুলে!
সুসভ্যতা উঠে এসে প্রাণপণে চেপে ধরে
অজাত কন্যার কচি টুঁটি।
যে মুখ দুধের স্বাদ এখনো পায়নি
তার কচি মুখে তুমি গরল পুরেছ
সুসভ্যতা তোমাকে অযুত ধন্যবাদ!

না গো, এই সকরুণ উপমহাদেশে
আর জন্মাবো না, আর ফিরে আসব না
মৃত্যুর চিকন ফাঁস পরে নিতে তোমাদের হাতে।
মেয়ে হয়ে জন্মাবো না আর।
'দেবী' শব্দের মানে অভিধানে 'পূজনীয়া'
ব্যবহারে দাসীই মেনেছ।
এই ভণ্ড মাতৃতন্ত্রের স্বদেশে
তন্ত্রাচারে মাকেই সবচে বেশী হেলা
হেলা ফেলা দিয়ে গেছো সুসভ্যতা তুমি।

না কোনো অভিমান না, অভিমান অতি
মহার্ঘ সঞ্চয়, ভুল ব্যবহারে তাকে
নষ্ট করা ঠিক নয়, রাগ নয় অভিযোগ নয়
প্রত্যাহার করে নিচ্ছি সমস্ত দাবীই—।

শুধু এক প্রার্থনা রেখেছি মহাকাল, তার কাছে
'—নারীহীন, মাতৃহীন, যোষিত সংসর্গহীন, বান্ধবীবিহীন
হয়ে বেঁচে থাক আহা আগামী প্রজাতি।'

আ মি বা ড়ি যা বো — বা ড়ি....

কখন হারিয়ে গেছি মেলার ভিতর

নিজেই জানিনা আমি, কার হাত ধরে
এলাম এমন অদ্ভুত মেলায়, কেন?
এত লোক, এত অসংখ্য মানুষ, কাউকে চিনিনা?
বেভুল বালিকা যেন একা একা শুধু
একা একা ঘুরি, আমি কোথায় পৌঁছব?
কে আমার প্রকৃত আপন, কোনখানে রয়ে গেছে
আমার আত্মীয়, প্রাণসখা, পরমাত্মীয়রা সব?
বিশাল মেলার মধ্যে হাজার হাজার লোক
এরা কেউ আমার আপন নয়? কেন নয়?
এত লোক ঘোরে, ওড়ে, নাচে, কাঁদে, গান গায়,
সুখের ঘূর্ণিতে উঠে পাক খায় আকাশজমিন।
আমি শুধু অনাত্মীয় মুখগুলি পড়ি,
পড়ে ফেলে বুঝে যাই ওখানে আমার
কোনো ঘরবাড়ি নেই, ছিলনা কখনো!

কে আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবে?
বাড়ি যাবো, আমি বাড়ি যাবো,—
তীব্র নিষ্ঠুর কান্নায় ভরে যাচ্ছে সব চরাচর,
চিরে যাচ্ছে উদলা বাতাস....।
বাড়ি যাবো.... বাড়ি যাবো.... বাড়ি....
শীত করে আমাকে গরম দাও।
কান্না পায়, আমাকে কবোষ্ণ কোল দাও।
কোলের কাঙাল আমি, বাড়ি যাবো বাড়ি....

কয়েকটি সামান্য প্রশ্ন

সমস্ত দুপুর ধরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে কূট তর্কে মেতেছে সে। সমস্ত দিন ধরে বুদ্ধির ব্যায়ামে বেলা গেছে। কে যে কাকে সৃষ্টি করেছে, কে যে কাকে স্নেহ দিয়ে লালন করেছে, মানুষ না ঈশ্বর কে কার পালনকর্তা কে কার রক্ষক এই নিয়ে দীর্ঘ দুপুর জুড়ে খরশান বাণ ছোঁড়াছুড়ি।

এখন বিকেলবেলা। রোদ মরে আসছে দ্রুত। খড়কুটো কুড়োনোর

মত কে এসে তৎপর হাতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে রোদের অবশিষ্ট কণা ও কুচি।

সে ঘরে ফিরে এসেছে, একা। একা ঘর। শান্ত অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে সব কিছু। পাশের বাড়ির রেডিও-য় বাজছে,—'নাথ হে প্রেম পথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও'—। সন্ধ্যা হয়ে এল। তার দুটি চোখ, তার্কিক ও প্রখর দুটি চোখ, বুদ্ধি ও যুক্তিতে শাণিত দুটি চোখ ভরে আসে জলে, কেন আসে? নিজেকে সে গুণগুণ করতে শোনে—'নাথ হে—'। কে নাথ? নাথ বলে কাকে তার ডাকতে ইচ্ছা হয়েছে গোপনে? চোখ কেন জলে ভরে আসে তার?

দীপক রায়

বা ব্ লা ল কে

কিছু না বোঝার আগেই আজো স্টেশন পেরিয়ে গেল—
একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হোল না তোমার
কি যে ভুল হয় ওই স্টেশনে নামার।
কি করে যে ভুল হল। কি করে যে এত ঘোর। এত আলো ছায়া
ঘিরে ধরে। ঘিরে ঘিরে ধরে। এত কোলাহল ভেতরে ভেতরে।
বিশ্বাস করাই কাকে।

হলুদ রঙের ভেতর কালো রঙে লেখা স্টেশনের নাম
আমি ঠিক পড়তে পারি পারি নি বাবুলাল।
তুই ওদের শুধু বলিস বাবুলাল
আমি দিনভোর চেষ্টা করেছি ওই স্টেশনে নামার।

ক্লা উ নে র শে ষ দি ন

ক্লাউনের মত ঢুকে পড়েছি রোদে ছায়ায় বাতাসে।
এক চাকার সাইকেল চালাই। ব্যান্ড বাজে, আলো জ্বলে।
হাততালি দাও। সিটি দাও। আমি যে তারের উপর
এক চাকার সাইকেল চালাই,
ক্লাউনের মত ঢুকে পড়েছি আলোয়, অন্ধকারে।
ট্রাপিজে উঠি, দোল খাই—এক আকাশ থেকে অন্য আকাশে।
শূন্যে ভাসতে ভাসতে ট্রাউজার খুলে ফেলি
তুমি শুধু হাস, বোকা, হাস আর হাততালি দাও ভীষণ।

এবার আমি সিংহের খাঁচায় ঢুকে পড়ি। গ্ল্যাডিয়েটর।
(কিছুকাল আমার সঙ্গে সার্কাসের ম্যানেজারের বনিবনা হচ্ছে না)
ম্যানেজার বলেছিলো সাদাকে কালো বল, রাত্রিকে দিন।
আমি যে ক্লাউন মজার খেলা দেখাই।
আমি কি সাদাকে কালো বলতে পারি।
আজ খাঁচা খুলে বুঝেছি নেশাগ্রস্ত পুরোনো কোন চেনা সিংহ নয়
বন থেকে ধরে আনা টাটকা সিংহের সঙ্গে আজ আমার যুদ্ধ।
আর যুদ্ধই যখন, তখন বলিকি—
উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, আপনারা একবার তালি বাজান।

মালিনী ভট্টাচার্য

নী ল অ প রা জি তা র

নীল অপরাজিতার
কঙ্কাল ছিল না।
পোস্ট মর্টেমের পর ভিসেরায়
পাওয়া গেল হলাহল,
ডালিমের ভিজে দানা,
লেনিনের ছবি।

নীল অপরাজিতার
দ্যুতি ছিল,
কঙ্কাল ছিল না॥

দীপশিখা পোদ্দার

স ঙ্গী ত

এতদিন দাহস্পর্শ উচ্চশৃঙ্গে চিনেছ আগুন
এবার মাটিতে নামো, হাত ধরো, প্লাবন চেনাই।

গোপনে পুড়েছে দেহ চিতাভস্ম কে দেখেছে তার
প্রহরী পিতার চোখে নাবিক সম্মতি আমি চিনতে পারিনা।

গূঢ় অন্ধকার ভেঙে জন্মক্ষণে জ্বলে ওঠে আলো
আলোচূর্ণ ভালে মাখো, চূর্ণ আলো প্রজন্মের
পরিচিত কপালে পরাও

সুজিত সরকার

শুরু নেই, শেষ নেই

আমার শুরু কি আমার জন্মেই ?
আমার শেষ কি আমার মৃত্যুতেই ?
আমার পিতা কি উপস্থিত নন আমার ভিতরে ?
আমার কন্যার ভিতরে কি আমি নেই ?

তাহলে আমার শুরু কোথায় ? শেষ কোথায় ?

ছড়ানো আকাশ, পাখি উড়ে যায়।

বিজয় মাখাল

ভারতবর্ষ

শাকপাতা কচু কোঁচড়ে লুকিয়ে নিয়ে যে চলে যায়
আমি জানি সে আমার মা নয়।
আমার মায়ের হাতে দুটো ভারি সাগুদানা গয়না রয়েছে
যদিও আমার মা ওর মত বিধবা
ব্যাঙ্কে তার সামান্য সঞ্চয়ে ভনভনে মাছির মত আমাদের হাত
আজ তিনি কাশীবাসী
কাল আমতায়
তবু, শাকপাতা গেঁড়ি ও গুগলী তুলে যিনি এইমাত্র চলে যান
তাঁকে যে ভীষণ মা বলতে ইচ্ছে করছে !

অজিত বাইরী

পাহাড়তলীর হাট

পাহাড়ের ঢালে মানুষের ভিড়।
আজ শুক্রবার, আজ হাটবার।
কেউ এনেছে বেতের ঝুড়ি, কেউ এনেছে
কোঁচড়ে ভ'রে গুটিকয় ডিম।
বিক্রি ক'রে তেল-নুন কিনে ফিরে যাবে
পাহাড়ী-গাঁয়ে।
পাথরের মতো রুক্ষ আর কঠিন
পাহাড়ী-মানুষের জীবন-যাপন।
বাহুল্য নেই কোনো, খুব সাধারণ
দেহাতী-মানুষ সব—
পৃথিবীর কতো বয়েস হলো, এরা জানে না।
এরা জানে না, ওলট-পালট হ'য়ে যাচ্ছে
পৃথিবীর মানচিত্র, ভাঙচুর হচ্ছে চতুর্দিকে।
এরা জানে না, রবীন্দ্রনাথ কতো বড়ো কবি।
এদের কানে পোঁছোয়নি র‍্যাঁবো, রিলকে ইত্যাদি
উদ্ভট নাম। এরা জানে না,
কবিতার ভাষা হ'য়ে আসছে গদ্যের মতো কঠিন।
এরা চেনে শুধু মাদল,
চেনে হাঁড়িয়া, শালের জংগলে
অগ্নিবর্ণ পাতার আড়ালে সূর্য ডুবছে।
হাট ভাঙছে, ফিকে হ'য়ে যাচ্ছে দেহাতী-ভাষার গুঞ্জন।
চড়াই বেয়ে উঠে যাচ্ছে মানুষের এক-একটি
ছোটো ছোটো ঢেউ

বাপী সমাদ্দার

আ ত্মা নু স ন্ধা ন

কিরাতের ছদ্মবেশে এবার অরণ্যে প্রবেশ। ছিলাম তেচোকা খড়্গের
নিচে কুকুরকুন্ডলী : সাপ ছোবলায়, কানে ছিদ্র নেই, স্বপ্ন সলিয়ে কলিয়ে....
শেষে শিকারের ছলে বন থেকে বনে কত অণিমা, জিরাফ দেখলাম।
শুঁট, পিপুল, মরীচে ঘেরা এ জঙ্গলে একাকী আসেনি, ঘোড়াটি রেখেছি
বেঁধে জাতী গাছে—এই হোল এক নকল নকল হরিণ বধের খেলা।
ছিলা টানটান ধনুক টংকার কচ্ছপী বীণার ঝঙ্কারে একতা চায় :
কালো কখন হলুদ, গোলাপি নীলকে জড়ায়, শাদা ফুটফুটে
কাশফুল তার পাশে আয়না—সরোবরে পদ্ম ফুটছে বাঙ্ময়....

দূরে একটা আশ্রমকুটির—বর্ণ যার সাত ঝিলিমিলি গোল বিষ্ণুপাতা ;
মাটি থেকে গাছ রস টানছে তার কুলকুল শব্দ এত শান্ত চারপাশ,
ময়ূরের স্তব, পাখির প্রার্থনা, সাপও এখানে ধ্যানস্তব্ধ
ঋষির মতন শান্ত শান্ত শান্ত।
দুদণ্ড জিরিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি, ফের দুদণ্ড জিরিয়ে
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কাকে ?
মাকে ফেলে এসেছি, স্ত্রী-পুত্র পরিজন ছেড়ে তিন রাত উৎকণ্ঠাময় উৎখাত :
ফিরতে গিয়ে একী ! মৃগয়ার ছলে যাকে খুঁজি সে তো আমিই স্বর্ণময়ূরী !

গৌরীশঙ্কর দে

হে সে ও ঠে নি শি ডা কে ত্রি পু রা

অপ্রাকৃত শব্দহীন ঘন এক নিস্তব্ধতার ভিতর নিশিডাকে
ঘুম ভেঙে যায়।
যার যায়, তারই যায় ; পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ হায়
হৃদয় সে ডাকে যায় ভেসে,
সবাই ভাসে না।

কেউ কেউ ভাসে স্রেফ ঢেউয়ের তরাসে
কেউ কেউ ভেসে যায় গরাসে গরাসে বিরহের।
মেঘ-বৃষ্টিজল থেমে গেলে আকাশের অসংখ্য তারায়
কারো কারো নিভে যাওয়া বাতিঘরে আলো বা পালক
সেইসব নারীদের ঝরে, কাছে কাছে ছিল যারা
একদিন ছায়ার মতন,
ও যাদের স্তন
শুক্লপক্ষে ছিল চাঁদের মতন অদ্রোহিনী।
কেউ কেউ এইভাবে অন্তর্মিল গ'ড়ে
অন্তিমে সমস্ত ভেঙে চুরে দেয় ;
এবং হে শবহীন যুগ যুগ ধরে ভাসা অন্তহীন গাঙুরের
ভেলা,
তুমি এসে স্তব্ধ হলে চোখের হাওড়ে
অসীম রহস্যময় শূন্যতার খোলে শুয়ে পড়ে লখীন্দরের মতো
ক্লান্ত মনন....

হেসে ওঠে নিশিডাকে ত্রিপুরা।

অমিতেশ মাইতি

শূন্য

সেই আলোর কথা মনে পড়ে, সেই শূন্যতার কথাও।
ঘনকৃষ্ণ নিশীথের বিলাপ পার হয়ে
যার সঙ্গে দেখা হলো তার ঠোঁটে মৃত্যুর আভা
তার হাতে কখনো আমারই দেওয়া বিষ শুকিয়ে কালো।
ঝরনার কাছে আমি যাই না ইদানীং—
জলপ্রপাতের শব্দে ভয় করে,
মনে হয় দমবন্ধ শূন্যতার সূচ এফোঁড়-ওফোঁড় করে যাবে
চোখের কোণে সেই আলোর উৎসব নগ্ন করে দেখবে আমাকে।

এত স্রোত এত ঢেউ উত্তাল করে তোলে মৃতজীবী শহর
আমি আলো ও শূন্যতা পায়ে-পায়ে নেমে আসি
অনাথের পাশে, অনায়াস চলে যায়
মাংসবোঝাই ট্রলি, কুষ্ঠরোগী ও ক-জন দিব্যোন্মাদ।
ইচ্ছে করে একবার তোমার হাত
ছুঁয়ে দেখি গরলের অপার মহিমা
আজও ঠোঁট ছুঁয়ে পাই কি না কুসুম-বেদনা....
এই যে ছড়ানো সুখ, আঁধার মথিত করা রাগ
গানে-গানে কী কথা বলে যায়?
মাননীয় জীবন
তোমার ঐশ্বর্যকে বিষ বলে মনে হয়।

অমিতাভ চৌধুরী

জীবন

আমি ফিরে পেতে চাই না কিছু।

শৈশব। শীতের দুপুরের বারান্দা,
আলসের শালিক;
উড়ে এসেছে মৌমাছি, তাকে দেখে ভয়;
বাগানের গাবগাছ
সন্ধ্যায় বাসায় ফেরে অশরীরী;
হুতোম প্যাঁচা,
মায়ের কোলে বসে রাজকন্যা ঘন চুলের স্বপ্ন,
আজ তাল গাছের মাথার ওপরের চাঁদ
চুমো দিয়ে যায় চোখে।
রাস্তায় রিক্সার ঘন্টা,
সদরের দরজা খুলে জুতোর শব্দ,
মাথায় বাবার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ।

এই হাত ছুঁয়ে বেড়ে উঠেছি আমি
আশ্বিনের হঠাৎ অংকুরে অসংখ্য কাশের মত—
সন্ধ্যায় পড়ব, বই খুঁজে না পাওয়া,
আর, মায়ের হাতের শেকল,
সারা বিকেলের খেলা শেষে
পরিশ্রান্ত চোখ।

উঠোনে বয়ে গেছে নদী,
লঞ্চের ঘাট,
যে মেয়েটি প্রথম আলতা পরেছে পায়ে
তার গালের ওপর এসে পড়েছে রোদ,
নরম রোদ অস্থির করে দিয়ে যায় তারে।

সময়ের হাত ধরে বেড়ে উঠেছি আমি
প্রথম পাপবিদ্ধ তরুণ,

তার বিহ্বলতা, আর,
গোপন ইচ্ছার উল্লাস।
ক্রমশই বেড়ে উঠেছি আমি
অনেককাল বছর,
জীবনের সূর্য উল্লম্ব হয়েছে মাথার ওপর।
আমি হারাইনি কিছুই,
ফেলে আসা দিনগুলি, যা কিছু আমার—
জীবনের বীজ।
বেড়ে ওঠার শাশ্বত পূর্ণতা
সময় দিয়েছে অনেককিছু,
স্মৃতি,
আত্মার গভীরে প্রত্যয়;
শিকড় মেলে ধরেছে জীবনের সবুজ,
অসীমে বিস্তীর্ণ হয়েছে তার সীমানা।

আমি বেড়ে উঠেছি শুদ্ধ সত্ত্ব চেতনায়,
সেখানে উজাড় হয়ে আছে আত্মজ স্নেহ,
ফেলে আসা দিন, উষ্ণ অনুভূতি।
আমার অনুভূতিতে এক প্রাচীনতা,
জীবনের, পৃথিবীর প্রাচীনতা,
তার প্রতি আমার দায়বদ্ধতা,
প্রাচীনতাকে নবীনতর করেছে পৃথিবী
তার চলার স্থিতিতে
জীবন আমাকে নিয়ে চলে পৃথিবীর কাছে।

যশোধরা রায় চৌধুরী

ক বি তা

হঠাৎ একদিন কিছু ঘটে যাবে, আমি
ফের আলোচনায় বসব, কর্মহীনতার
প্রারম্ভিক জরায়ুকে ছিঁড়ে তুমি আসবে সকালে
ত্রিভঙ্গ রবিন হুড, অমিতাভচ্চন,
অবাস্তব রকমের ব্যক্ত, বিচক্ষণ...

ত্রিপুরাসুন্দরী কায়া কখনও আমারও
ইচ্ছা ছিল হয়ে যেতে, হঠাৎ একদিন
বিপুল মথিত করে অনাহূত জনে
পূর্ণ প্রকাশিতা হতে—দুহাতে তামার ও

নিকেলের কোশাকুশি, প্রবল বিদ্যুতে
তার থেকে পুণ্যজল ছুঁড়ে দিতে দিতে
সর্বকায়া নদী হয়ে মাটিতে নাবারও...

হঠাৎ একদিন কিছু ঘটে যায় নি, যায় না কখনও
বলেছে বিশুদ্ধ তত্ত্ববাদী, আর তোমার নিজেরও
অবিশ্বাস ছিল ব্যাপারটায়; তাই হল না রমণ॥

না রী

এবার রমণ খোলো।
আমি সেই ছিন্নলতা নই
লুটাবো ঘামের বৃন্তে, শৃঙ্খলিতা, ঋজু ডালরেখা
জড়ানো প্রগল্ভা মেয়ে, নাভিশ্বাসে; মগ্ন থাকা মই
বেয়ে উঠে যাবো ছাতে, নীল সে টিলার
ছাতে, যার অন্য নাম মালভূমি, তৃপ্তমহিলার

মতো। আমি বৈ-
দর্ভীর শরীর জুড়ে অন্ধ গিরিগুহা—

যার মধ্য থেকে ঝাঁপ দেবে চিতা, শুদ্ধ শ্বেতচিতা—
সেরকম পবিত্রতা নই।

আমি সেই ক্রুদ্ধ প্রেম যার কোনো পরিত্রাতা নেই—
ঘুমোলেই, ছাতময় নেমে আসে চাঁদের অম্লতা
ও আলোক—চট্‌চটে, সমুদ্রের লবণ হাওয়ার
মত বসে গেছে গায়ে—ঘাম নয়, ভালোবাসা, নৈ-
শ বিহার, অতএব প্রেমিক পাওয়ার
আশা ক্রমাগত বিষণ্ণই।

স্বপন রায়

দুঃখ ব্লিচিংঃ আস্‌রা

মেধাবী চশমা হবে তাকিয়ে গ'ড়ে নেওয়া
যদি একরাত্রি বাঘ
                    এই মেয়ে বহতার দুধ-চা
হবে এই বিকিরণ
এই চশমা ধুনে ডেনিম এলাহাবাদ

শিরা বিনুনী পেরিয়ে
                    ক্ষার চৌরাস্তা ডিজেল
যেদিকে তাতানো উৎপাদনশীল
আহ্নিকম্‌ সেলওয়ার
আমাকে রাখা করা মেধা বুম বাম
                              'আস্‌রা' যেমন
রোদ নিক্তিতে মাপা ইঁটে বালুতে হেমনৌকো

মেধা চশমা ঠিক হ'লে
একটা সিংঘ জন্মায় একহাজার ধুলোবি

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

ম্যা টি নি শো

গাঢ় হয়ে এলে ছায়াছবি
ফিকে নীল লেকটিকে ঘিরে
সেই যে দুপুর হয়েছিল
তার কথা ফের মনে পড়ে
'শোনো, ঠিক সিনেমার মতো,
আমাদের ভালোবাসাবাসি'

মেয়েটি শিউরে উঠে বলে
এবং তখনই পাশ ফেরে
আলোহীন বন্ধুটির খোঁজে
ছেলেটিও ব্যস্ত ছিল খুব
বাঙালি আঁচলখানি নিয়ে
এবার জানাল তর্জনে
'মুখ দেখা অপ্রয়োজনীয়'

মধুসূদন ঘাটী

দীর্ঘসূত্র

যতো দূর তোমার ছায়ার রশ্মিমুখ
আমার পায়ের নীচে মূর্খ মাটি কাঁপে
কীভাবে বাজাই তাকে বলো তুমি
পাতার দুপিঠে আঁকা প্রতিমার চোখ ও চাতুরী
ঝুঁকে পড়ে যতো দেখি ততো কৃষ্ণবাঁশ
সপ্তাক্ষরবাসী সুর ভেঙে পড়ে
আমি তো ছুঁইনি তার মূর্ছনা ও মাধুর্য
শুধু দেখে দেখে ব্যথা করেছি চোখের পাতা
যতো দূর তোমার গায়ের গন্ধ ফেলে গেছো
আমি যাবো বাঁশি ছুঁতে বর্ণপ্রিয়
পায়ে পায়ে জড়াবো তোমার চিহ্ন
দেখো, তুমি যেন আরো দীর্ঘ না হয়ে যাও!

কানাইলাল জানা

নারী ও নদী

ছবি আঁকতে আঁকতে
ছবি আঁকতে আঁকতে তো....,
তেমন নারীর ছবি হল কৈ?
তড়িঘড়ি আঁকলুম স্লিম ফর্সা নারী, অর্ধনগ্ন,
চোখ মুখ দেখে বুঝলুম
নুরজাহানের ভঙ্গিমায় সে গোলাপ চাইছে
বেশ বসরা গোলাপ দিলুম হাতে
অসীম আমার বন্ধু তারিয়ে তারিয়ে দেখল :
হুঁ, এমন অশ্লীল নারীর হাতে জ্যান্ত গোলাপ!
পরদিন আর এক বন্ধু বিকাশের মন্তব্য :
বাঃ মরা গোলাপ হাতে এমন জীবন্ত নারী!
শান্ দেওয়া খুরের মত চক্‌চকে তার দুটো
চোখ, ধেয়ে গেল নারীর দিকে, হাতে
টান মেরে বললুম কাগুজে নারীকে দেখে যদি....
কিন্তু কী আশ্চর্য! অর্ধনগ্ন নারী এখন নদী,
বইছে ছলাৎ ছলাৎ....
বন্ধুর সকৌতুক হাসি : কে বেশী বিশ্বাসী
নারী না নদী?

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

ই চ্ছা

নীলাঞ্জনের ছোটভাই আমাকে প্রায় বলে, নন্দিতাদি, তোমার হাসি দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় এল ডোরাডোর সেই জলপরীদের কথা, যারা খেলা করে সোনালী মাছেদের সঙ্গে—কথা বললেই যাদের দাঁতগুলি মুক্তোর মালার মতো হেসে ওঠে। জান নন্দিতাদি, এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে স্বপ্নের মধ্যে পাড়ি জমিয়েছিলাম এল ডোরাডোয়—এক মাস্তুলওয়ালা হার্মাদদের জাহাজে।

সেই থেকে আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছে অদম্য এক ইচ্ছা। দীর্ঘদিন সযত্নে লালন করেছি সেই ইচ্ছা। এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে আমিও যাব নীলাঞ্জনকে নিয়ে এল ডোরাডোয়—
অপেক্ষা শুধু একটা মাস্তুলওয়ালা হার্মাদদের জাহাজ।

অ জ্ঞা ত বা স

মনে পড়ে সেই কান্নাভেজা রাত্রি
আর রক্তমাখা সন্ত্রাসের দিনগুলি—

মনে পড়ে মরিচঝাঁপির সেই
ছিন্নমূল শরনার্থীর মর্মন্তুদ গাথা—

এস বরং নির্জন পাহাড়তলির ছাউনিতে বসে
উপভোগ করি অমলতাস দুপুর!

দেব চক্রবর্তী

শ্যা ও লা র ঘ র

সে এক অক্ষত্রিয় বালকের কথা। নীলপাড় নদীজলে
সাদা গমের বীজ নিয়ে নৌকা বেয়ে যায়
ঢেউ রং সাদাসাদা ফেনা শ্যাওলার ঘরে ঢুকে পড়ে;
দূর বালুকায় সাজানো মালা ভঙ্গুর-নীল আলো এসে ভেঙ্গে দেয়
সমুদ্দুরে যাবার সাঁকো। পরীর দেশের বাতাস প্রার্থনা করে বালক—
অক্ষত্রিয় বালক মুকুল চেনে না ফুলের গন্ধ পেতে চায়,
বাঁশ জ্যোৎস্নার রাতে জেলেপাড়ার গল্প শুনে নেচে ওঠে তার নাবিক মন
চাঁদের সেতু বেয়ে ছুটে যায় অলৌকিক উপত্যকায়।

জ্যোৎস্নামেয়ে কাঁধে হাত রাখে, জলসই খেলার মতো
নরম শরীরে এঁকে দেয় নীল উল্কি
আনন্দ আর যন্ত্রণায় ঘুমিয়ে পড়ে।
রাতদিন তার শিয়রে বসে থাকে সেই মেয়ে, হাতে মুকুল,
পাট-পাট ওড়নার ঢেউ ভেঙ্গে গান গায়
সেই গান শুনতে শুনতে হঠাৎ চোখ মেলে দেখে
নৌকাতেই শুয়ে আছে তার জ্যোৎস্নামেয়ে
আর ফুলের গন্ধে ভরে যাচ্ছে শ্যাওলার ঘর।

শি শা ডি হি র মে য়ে

তাদের কথায় থাকে আকাশ নদী মেঘ, নদীপাড়ের কাহিনী
শুনিয়ে শুনিয়ে গান বাঁধে কাজল মেয়ে,
নিস্তব্ধ দুপুরে ঘুঘুর ঠোঁটে ঝুলে থাকে স্নানের ঘাট
নদীর বাতাস পানকৌড়ির ডানায় গোপনে উষ্ণতা ছড়ায়
আর ভুল করে কালোমেয়ের খোঁপায় ফুল গুঁজে দেয়,
মেঘও তখন আকাশ সামলাতে সামলাতে গুনগুন করে
সেই সুরের মূর্ছনায় শিশাডিহির কিশোরী মেয়েরা
একে অপরের হাত ধরে নদীর জলে নেমে যায়

এবং নদীর মতই চিৎ হয়ে আকাশ গিলতে থাকে—
তাদের রোমাঞ্চিত শরীরে শ্যাওলা জড়িয়ে যায়
কিছুতেই ছাড়াতে পারে না

নদীকথার ভোর

রাত্রিশেষের তারা কুয়াশায় মুখ ধুয়ে বসে আছে
কখন নদীপাড় থেকে উঠে আসবে রঙিন চাদর—
দ্বীপভূমির ক্লান্ত আলোয় জেগে আছে নির্জন সাঁকো,
সারারাত পাহারা দিল যে পাগল সে-ও নেমে গেছে জলে
দেবদারু শরীরের শিশির ধুয়ে দেখবে অলীক ভোর,
একটু একটু করে ভাঙ্গে ধাতব রাত, গুঁড়ো-গুঁড়ো সোনার ছাই
উড়ে এসে দখল করে মাঠ, নদীপাড়, দ্বীপভূমির নির্জন সাঁকো,
পালকির দোলায় চড়ে ফিরে যায় পৌষের চাঁদ
রাইশস্যের মাঠে মেলে দেয় হিম শিশিরের ডানা
রাত্রির করুণ মোহনা গমক্ষেতের আলে প্রাতঃভ্রমণ সেরে
নিঃশব্দে হেঁটে যায়—যেখানে আমাদের স্বপ্নের মেলা,
নীল হাওয়ার জামা পড়ে বসে থাকে দোল-দোলানি আকাশ—
গড়িয়ে গড়িয়ে নামে তরল রোদ, চাদর সরিয়ে দেখে
আলো সম্পাতে জেগে আছে নদীকথায় ঘুমের শয্যা।

ঘরে ফেরা

আমি কোনদিন ঘরে ফিরিনি
ঘর আমাকে নেয়, অপমান সাজিয়ে রাখে।
কখনো জানালায় উঁকি দিয়ে দেখি
চেনা মুখ মুখোস এঁটে বসে আছে
ওরা কি আমার বন্ধু? আত্মীয় পরিজন?
দরজার কড়া নাড়ালেই হুড় মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে সম্পর্ক
অপমানের স্রোত বরফ ছুরির ফলায় গাঁথা দেখে

অক্ষম মানুষের মতো হাওয়ার সাথে যুদ্ধ করি
যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হই, পুনরায়
ভালো মানুষের মতো একটা একটা করে অপমান সরাই

ঘরে ফেরার পথে আগুন জেললে হাত সেঁকে নিই
কখনো যদি বলতে পারি—কে আছ, আমার ঘর খুলে দাও!

শম্ভু বসু

বিবেকপুরুষ

শেষ হয়ে যাবার কথা ভেবো না বিবেকপুরুষ
ছড়িয়ে দাও তোমার শিকড় জলের মতো
দুঃখভূমির শরীরে—
ওরাই তোমাকে বুঝবে, বুঝবে তোমার প্রয়োজন কতটুকু।

আসলে কৃতজ্ঞতাবোধ বলে আর কিছুই নেই ওদের
বরং
দুঃখভূমির সে জায়গায় তোমার এখনো প্রয়োজন—
মিলনে তোমার পাবে পূর্ণতা ওদের শরীর।

স্থির হও, শান্ত হও, বিবেকপুরুষ;
পেঁজা তুলোর ফাঁকে উঁকি দেওয়া চাঁদের ক্ষণিক আলোয়
ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক পূর্বমুহূর্তের ছবি।

সবসময় কি পাওয়া যায় বিবেকপুরুষ
বাতাসে দোপাটির নির্মল হাসি?

সন্দীপ চক্রবর্তী

বেঞ্জামিন যে স্বপ্ন দেখতেন

১.

গলায় মালা পরালে
আমরা খুব কাঁদলাম
চোখের সামনে দেখি স্পষ্ট ছবি
জল্লাদের হাতে নিহত চাঁদ
মুখখানি ঠিক ক্ষুদিরাম।

২.

ফুলের স্তবকে স্তবকে
আগুন জ্বালায়
ভ্রমর
ভয়
তোমার বুক কাঁপায়
এই সময়—
পাখিরা উল্লাসে ডানা ঝাপটায়।

৩.

রাগলে তোমার মুখ
সিঁদুরে মেঘ
আমার ভালো লাগে।
এই সময়
প্রাচীর ভাঙা ফুলের স্তবকে স্তবকে
আমি ভ্রমর হয়ে
বিন্দু বিন্দু বারুদ দিয়ে যেতে পারতাম!

সুহাস বসু

রুনি

ভালবাসার মেয়েটিকে আজ
সব খুলে বলেছি
বলেছি বেঁচে থাকার জন্য
যতটুকু দরকার তার বেশী
একটু'ও আমার ভাললাগে না
আলস্য আমার খুব প্রিয়
আর মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট ভ্রমণ
এধার ওধার।

আমার সবচেয়ে বাজে লাগে
মানুষের মুখোমুখি হতে
মানুষের জংগলে হাঁটাহাঁটি
সংলাপ, দেঁতো হাসি
দেখা হলেই শুধু—
কোথায় আছ? কি কর আজকাল?
কোথাও নেই মশাই, কিছুই করি না
শূন্যে ভেসে আছি।
রোদে আঙুল বুলিয়ে ছবি আঁকি,
বাতাসে ঘরবাড়ী বানাই—
ফের ভেঙ্গে ফেলি।

আমার সবচেয়ে ভাল লাগে
কাজে কামাই দিতে
কুঁড়ের বাদশা কুঁড়ে
মাথার নীচে বালিশ
পায়ের ওপর পা'
বাইরে মানুষের অবিরল স্রোত
প্রতিবাদী স্বর দিনরাত
ছাদের ঘর থেকে এসব দেখি

আর মনে মনে হাসি

ওগো রূপের দ্যুতি
সময় চুরি করে আমি
পুরোন অ্যালবাম ঘাঁটি
ভেজা চোখে খুলি
হলুদ চিঠির বাণ্ডিল
নিরালা দুপুরে বাড়ীময়
একা একা ঘুরি
অলিন্দ, ঠাকুর-দালাল জুড়ে শুনি
কবুতরের ডাক

একজোড়া ঘুঘু রোজ দুপুরে
উঠোনের জমা জল খেতে আসে
দেয়ালে ছবির ফ্রেমে পূর্বপুরুষের
চোখ ছলছল—

এখন থেকে শুধু
এসব নিয়ে সময় কাটাব

খুকী, আমায় ক্ষমা করো।

কুন্তল মণ্ডল

সরীসৃপ

সম্মুখে ওই পাহাড়
ওই তার ঢাল দিয়েছে খুলে।
বস্তুতঃ এও এক নাবিক;
দিগন্ত প্রসারী ওই তার পাল,
দূরে জাগছে যাত্রীনিবাস....

খোয়াই-এর পথে আমি একা,
বুকে হেঁটে যাই পেরিয়ে—

সেই কি আমার
গোপন ক্ষতি,
সঞ্চয়,
ফণার আকাশ....

রাহুল রায়

চাকরি

ধান কাটা হয়ে গেলে শেষ
ঘাসের বোতাম খুলে শুয়ে রয় মাঠ,
সারারাত পারাবত নিয়ে।

দূরে দূরে ফেউ ডাকে
ফিকে নীল চাঁদ রাতে
পাতা পুকুর পারাবত ডানায়
সরব হয়ে ওঠে এই একরাত।

তারপর,

সুস্থ কথার ভীড়ে
দুহাতে পাপ মাখতে মাখতে
জানি আমি ঠিক ফিরে যাব—
খুন-রক্ত-জখমের খবর সাজাতে।

সেখ মহিউদ্দিন

এবং অন্তরা

প্রতিদিনের মতো আজো তোমার
কথার সপ্তমসুরে
বেজে উঠে সীমাহীন রূঢ়তা
অথচ
একক জীবনের ফেলে আসা দিনকালে
ফিরে দেখি : মোহনবাঁশীর সুরে
মাধুর্য জড়ানো সকাল। প্রিয় ভালোবাসার ঘরে
আকাশী হৃদয়ের গান।

বড্ড ভুল দেখা হোল সেদিন
বড্ড ভুল দেখা হোল সেদিন

সাংসারিক উঠোনে রূঢ়তা থাকে
রুক্ষতা থাকে দ্বন্দ থাকে

জমা থাকে কিছু অভিমানী গোপন কথা।

থাকুক, চিরদিন চিরকাল।

তবুয়ো
প্রতিদিনের মতো একদিন
সূর্যভোরের অভিমানে
মধ্যরাতের অহংকারে
তোমাকে ফিরিয়ে দেবো
গর্বিত স্ববোধ।

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ

অগ্ন্যুৎপাত

এখন ঘুমোতে গেছে শীতের বাতাস
তবুও মাটির ঠোঁট ফেটে চৌচির
তবুও ও গায়ে যেন আঁকি বুকি দাগ
কর্কশ সাঁপিনী খোলশের ভিড়।

ফাটল আগুন খায় চাষী বসে ঘামে
ঘাম দিয়ে নাম লেখে জমির উপর
ওপাশে নধর শিষ নলকুপে জল
চাষী বউ খুঁজে ফেরে তোলপাড় ঝড়।

কতটা সূর্য খেলে আগ্নেয়গিরি
উবু হয়ে দেখা, দেখা সেই জ্বালামুখ
কখন উদগীরণ কখন সে বমি
পুড়ে যাক পুড়ে যাক নিষ্ফল বুক।

কৌশিক গনাই

তুমি

গোধূলিতে নৌকা বাঁধা থাকলে—
তোমাকে নির্জন মনে হয়।
অন্ধকার ধ্বনিতে শঙ্খ বাজলে—
তোমাকে স্নিগ্ধ মনে হয়।

আমার শ্রাবণ
তোমার আকাশ মেঘের ওড়াওড়ি;
আমার শ্রাবণ অঝোর ধারা নদী।
তোমার দুঃখ পাল তোলা দূর ভেলা ;
রাত্রি আমার দীর্ঘ সমাপন।

শেফালী চক্রবর্ত্তী

আল্লা মেঘ দে, পানি দে

আগুনঝরা তেপান্তরের
ধূ ধূ করা মাঠ,
আকাশ তার সোনার বাটি
উপুড় করে তাপ,
গ্রীষ্ম এলো শূন্য হাতে
নির্জলা পুকুর ঘাটে।

মাথা কুটে মরছে কৃষক
বর্ষা এলোনা,
গাঁয়ের বধূ আদুড় গায়ে
ভিজতে পেলোনা।

আল্লা মেঘ দে, পানি দে
আল্লা কথা রাখেনা
মাঠের ধান ফুটি ফাটা
বঁধূ চিড়ে কোটেনা
ফুলের বাগান শুকিয়ে গেল
ভ্রমর গাইতে এলোনা
কদমগাছ দাঁড়িয়ে আছে
ফুল ফোটেনা
আল্লা মেঘ দে পানি দে
আল্লা কথা রাখেনা।

দীপকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী

নেমে এসো

নেমে এসো
হে হাল্কা চাঁদ, পলতা চাঁদ
সোনালী, আম আঁটির মত চাঁদ
এই জংঘায়
বজ্র-কঠিন অথচ বিহ্বল
এই অন্ধকারে,
ঐ দিকে চেয়ে দেখো
তামস-ঘন জলায়
কোনো নৌকা (অথবা জন্তুর)
পাঁজর-কঙ্কাল
মৃত ঘাসের মাঝে
অনন্ত শয়নে
কেমন বেবাক গাঁথা থাকে।

চিঠি

তোমার চিঠি এল অবশেষে
ততদিনে আমাদের সেই বটগাছটা,
আচমকা ঝড়ে নিহত।
হতাহত বহু অনেকে
এবং আমি আবার মাথা ন্যাড়া করেছি।

তোমার চিঠি এল অবশেষে
ততদিনে আমার শব্দ সব শেষ
দুহাত শুধু ক্রুশের অঙ্গীকার
এবং, দিনগুলো আবার লম্বা হতে শুরু করেছে।

অথচ এদিকওদিক তোমায় বহু দেখেছি

আচমকা আয়নায়, পাশে
সমুদ্রের জ্বলন্ত জটায়
বহুবার, বারবার
মৃত্যুর স্বপ্নের মত।

আসলে, এই অন্ধ কবরে বসে বসে
আমি কাউকে না জানিয়েই মরে গেছি
সেই কবে
বহুবার, বহুদিন আগে।
তবুও ত তোমার চিঠি এল
যখন পাখিগুলো তাদের ডানায়
আকাশটাকে ধরে
নিয়ে গেছে দূরে কোনো শীতের দেশে
যখন মৃত ছাড়া এই শহরে হাসে না কেউ
এবং আমার কব্জি দিয়ে
অনর্গল ফোঁটা ফোঁটা জীবন চুঁইয়ে পড়ে।

কৌশিক ঘোষ

ঘাস

ধূ-ধূ প্রান্তর, কতগুলি সবুজ ঘাস,
এখানে আগাছা পেরিয়ে তাই সময়
এসেছে; প্রাচীন আকাশ জালে কখনও
স্বপ্নবীজ প্রেমিক মন্ত্রে দূর দিগন্তের
শরীরে ছড়ায়, একজোড়া প্রস্তর
ভূখণ্ড : রোমকূপ ছিন্ন জলে ডাক
পায় আশাতীত, কোথাও বা সবুজ ঢল
বেড়ে ওঠে দ্রুত, অমসৃণ।

বৃষ্টি শব্দ ছিল এক কাল অবধি,
সজ্জাত হিমের শরীরে যে শব্দ শুষে
নেয় রাত; মাঝে মধ্যে ঘেমে ওঠে
শরীর ছাপানো জল, যেন তারা
বৃষ্টি উতাল—আর সব ছিঁড়ে ফেলা
মুথো ঘাস, কখন যে ফেলে আসে
নারী; রাত্রি অবসরে শুদ্ধ বিস্তার তার
পাতাল গর্ভে : আমাদের মত সব
শিরা, উপশিরা, ছায়া অথবা মৃত প্রচ্ছায়া
বেড়ে ওঠে দ্রুত, অমসৃণ।

কোথাও কোথাও তার স্বপ্নের নীল মিল
যেখানে নরম স্তন, কিশোরীর ঠোঁট—
আর থাকা হিংসার কাল—সব কিছু জেনে
নেওয়া, কোথাও বা কিঞ্চিৎ বেশী পাওয়া
জীবন বৃত্ত মাঝে রোম ছেঁড়া এহেন শরীর
রেখে যায় : রোঁয়া ওঠা এক চিলতে ফাঁক
সাক্ষীবিদ্ধ কথার জীবনে, মুষ্ঠির মোড়কে
থেকে শুকিয়ে গিয়েছে; তবু দিন, আলোর
শব্দে আশার আলো দেখে মাঝে মধ্যে

জেগে ওঠা রাত ঘাস স্বপ্নে দ্বিগুণ হয়
বেড়ে ওঠে দ্রুত, অমসৃণ।

ঠাকুমা

বুড়ি থুবড়ী ঠাকুমা,
সবেমাত্র আশি, মাঝে মধ্যে
এই কাঠ ফাটা রোদে, মুষল বৃষ্টিতে
শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় মলিন শরীর
গ্রন্থিতে, লাঠির ঠক্ ঠক্ ঠিক
দ্বিপ্রহরে, যেন মৃত্যু নিদান হাঁকে
এক দুরন্ত হাপরের নিশ্বাসে ; একটি
মাত্র চুল, তাও কালো—সেই
আশার সজীবতা ভাঙে বৃদ্ধার জীবন্মৃত মুখ,
বাকীটা শুধুমাত্র ঢাকা এক কার্পাস মলিনতায়
সাদৃশ্য কেবলমাত্র তার শরতের মেঘ
ঠিক আর পাঁচজনের মত।

ঠিক আর কয়েকজনের মত নয় ;
তার ঘোলাটে চাহনি, স্থবির পায়ে
দীর্ঘ মাইল খানেক চলা, আর
সত্যদ্রষ্টার মত কথা—'কদিনই বা
বাঁচি, তাই ঠুকি লাঠি এই মাটি' ;
পর্বতারোহিনীর উল্লাস রোমাঞ্চে খুঁজি
একটি দুটি করে সে বছর গুলি—
যে বছর বাসন্তী পাতায় যুবারা লিখে যেত
ভালোবাসার ঝিরঝিরানি,
ঠিক আর পাঁচজনের মত নয়।

গৌতম হাজরা

১৪০০ সাল

সন্ধে নীচু হয়ে আসে।
বিবর্ণ দিনগুলি ছেঁড়া সুতোর তারে ফিরে যাচ্ছে এখন
জলের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে জেগে উঠছে মহাজাগতিক ধ্বনি
বাতাসে টান—হেঁই—হো—।

মনোমুগ্ধকর বীণার তারে কে আমায় টানছো?
যাচ্ছি, যাচ্ছি আমি মনোমুগ্ধকর
আজ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে শুনছি শতাব্দীর গান
আজ রক্তের ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছলছল
উথালিপাথালি স্রোত
অন্ধ সড়ক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে ঘোড়া
আজ নিক্ষিপ্ত তীরের ভেতর যুগলবন্দী শুনছি।

আজ এই প্রাক্ মুহূর্তে
সবুজের থইথই বিপুল কল্লোলের মধ্যে
অজানা ফুলের গন্ধে
আমি ভেসে যাচ্ছি এক আশ্চর্য জলস্রোতের দিকে
হে ১৪০০, আমাকে গ্রহণ করো
গ্রহণ করো রক্তকরবীতে!

গায়ত্রী গুপ্ত

মর্মস্থলে বাঁশী

অজীবীয় নজরানা দেয়, বটতলার তেল সিদুর মাখা শিলা,
জলস্রোত গভীর অন্ধকারে অবুঝ। দমকা হাওয়ায় বুক
ভরে যায়, বায়ুতে মা'র গন্ধ—ক্ষরণ হয় অপত্য স্নেহ।
বাগদত্তাকে দেবদাসী করা অপরাধ। জল নির্গমন পথ
দিয়ে বয়ে যায়, ছোট কোন পোকার লালারস দিয়ে গড়া
বাসা, তৈরী করা চতুর্বর্ণ। ঋত পটুয়া মনঃপুত ছবি আঁকে
না বহুকাল, তার বেদনার অনুভূতি কৃষি কাজের মতো স্নিগ্ধ
হয় না বলে।

খড়ি মাটিতে তিলক কাটে বাউল; চোখের তারায়
জ্যোৎস্নার ব্যথা। খেয়াঘাটে পার হয় বৌদ্ধভিক্ষু, ঝোলায়
থাকে তমিস্রার ব্রত। করজোড়ে যুগেরা সুবিচার প্রার্থনা
করে—কাব্যকুঞ্জে গানের ধুয়া তুলে মালসীতে হাত
রাখি....ক্ষমত্ব পত্র দিই শ্বাসজনে।

দীপক কর

যে আমাকে আগলে রাখে

যে আমাকে আগলে রাখে
গার্হস্থ্যের মায়াতন্তুর নিবিড় আশ্লেষে
সকাল দুপুর সূর্যাস্তের ছায়ায়
বানপ্রস্থে দেখা হবে কার সাথে?

অমল চিত্রল ছায়ায়
ময়ূর ময়ূরী
ভালোবাসার ঘর বাঁধে

গোবিন্দ গোস্বামী

ফাঁক

দক্ষ ধীবরের মতো সূক্ষ্ম জাল ফেলে
পেলে না কিছুই
আসলে দিঘির নিচে জমা করা
শুকনো আগাছা কাঁটাকুটো জমানো জঞ্জাল
তার ফাঁক দিয়ে
সন্তর্পণে পালিয়েছে ঈপ্সিত শিকার

দক্ষ প্রেমিকের মতো হৃদয়ের জাল ফেলে
পেলে না কিছুই
আসলে ভালোবাসার শূন্য পাত্রে
অসংখ্য ছিদ্রের গ্লানি অন্ধকার অবিশ্বাস
তার ফাঁক দিয়ে
অপরাহ্নের আলো হয়ে উড়ে গেছে সকালের মুখ

এপার-ওপার

স্বপ্নের সায়াহ্ন থেকে যাত্রা শুরু বিপন্ন খেয়ায়
বুকের ভেতর দাঁড় টানার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ
দুরন্ত কৈশোর থেকে সাধিত যৌবন ভেঙে স্মৃতির উজানে
কতো সময়ের দুঃসময়কে সঙ্গে নিয়ে জীবন ফেরার

হায় ভালোবাসা, আর কতোদিন পুতুল খেলায়
ঘর বেঁধে ঘর ভেঙে মিথ্যে যাতায়াত
দীর্ঘ সময়ের হাত ধরে বিষণ্ণ সফর
সূর্যের পোশাক থেকে কবে নামে উষ্ণ ঋতু?
চৈত্রের কৃষ্ণচূড়ায় জেগে থাকা রক্তিম উচ্ছ্বাসে
সমাপ্তির পদাবলী বসন্তের দুরন্ত প্লাবন

স্বচ্ছ সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে মৌসুমী পাখির গান
কবে ভেঙে দিয়ে যাবে শুষ্ক হৃদয়ের এপার-ওপার

অভীক ভট্টাচার্য

নি র্বা স ন

১.

ভুল একটা অর্গানের মধ্যে দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে সাদা রঙের হাওয়া। আমাদের চারপাশে জ্বলতে-নিভতে থাকা নানারঙের আলো, সেই আলোর নিচে আমাদের ভোঁতা আর আঁকাবাঁকা আঙুলগুলো, এখন ঢুকে পড়ছে লম্বা একটা সাবওয়ের মধ্যে। কবে আমরা ভুল করে পৌঁছে গিয়েছিলাম একটা বইয়ের দোকানে আর সাদা-সাদা অক্ষরের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, পোকার মতো শুঁড় আর কাঁটাঅলা হাত দিয়ে আমরা চেটে-চেটে দেখছিলাম অক্ষরের দেওয়াল, এখন আবার ফিরে আসছে সেই সাদা-সাদা শব্দের শাসন

আর মাটির ওপরে, নিঃশব্দে, শহরে ঢুকে পড়ছে একটার পর একটা ট্যাঙ্ক, তাদের চাকার দাঁত থেকে ঝরে পড়ছে কুয়াশাঘেরা অন্ধকার। কুয়াশার ভেতর থেকে উঠে আসছে উঁচু-উঁচু কাঁটাতারের পাঁচিল, তার পাশগুটে হাত কিম্ভূত ল্যাম্পপোস্টের মতো উঁচিয়ে আছে আকাশে

২.

রোবট-মানুষ, দেখি রোবটের মানুষরা দলে দলে ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়, যখন ধুলো থেকে তুমি কুড়িয়ে নিচ্ছো বিষণ্ণতা, আর আরেকটি সন্ধ্যা নামছে তোমার শহরে

যে ঘাস-ফড়িঙেরা তোমার সঙ্গে রোজ ইস্কুলে যেতো ছোটবেলা, সার্কাসের তাঁবুর পাশে গান গাইতো হাততালি দিয়ে, তারা সম্ভবত আজ লুকিয়ে পড়েছে ফর্মালিনের বোতলে, রাস্তা জুড়ে একটা-দুটো-তিনটে-চারটে রোবটের ফড়িঙ কেবল চলে যাচ্ছে বাজনা বাজাতে বাজাতে

আর একটা মেঘ, তীব্র ম্যাজেন্টা রঙের গাঢ় আর ভারী আর জমাট একটা মেঘ ঝুলে রয়েছে তোমার মাথার ওপর, যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে না কোনওদিন। কোনও এক ঠাণ্ডার রাতে সেই মেঘের নিচে লালচে বরফ মাড়িয়ে হয়তো হেঁটে আসবে পুরনো পৃথিবীর মানুষরা, তখন কী গান গাইবে তুমি

বুবুন চট্টোপাধ্যায়

প থ নি র্দে শ

শালিকের ঠোঁটে পিছলে পড়া রোদ

ঐ একফালি রোদে
আমাদের বুড়ো ডাকপিওনের জামা
উড়তে উড়তে কিভাবে পতাকা হয়ে গেল,

বহুদিন এ পথে আসে না কেউ

ও বাড়ীর ছাদে সন্ধ্যাদিদির লাল টুকটুকে শাড়ি
সেই কবে থেকে কার্নিশে ঝুলে আছে
একা একা নির্জন বিষাদে

এদিকে আসে না কেউ
ও দিকে যাওয়ার কেউ নেই,

বাবা বলেছিল কলোনির সব পিচ রাস্তা ধরে
একদিন হাঁটব দুজনে,

রাস্তা বন্ধ, পাঁচিল প্রমাণ

মোড়ে মোড়ে ঝগড়া করে
পাঁচমেশালী লোক

চোখে চোখে হিংসে ছড়ায়
পাঁচফোড়নের বিষ

বহুদিন একফালি রোদে
এ পথে....

সন্ধ্যাদিদির লাল টুকটুকে শাড়ি
বুড়ো ডাকপিওনের জামা
আমার বাড়ীর সঠিক নির্দেশ

যদি পারো এসো কোনদিন।

বি কে ল বে লা র চি লে কো ঠা

এইভাবে রোজ একটা করে বিকেল শেষ হয়
আর আমি বেলকুঁড়ির গন্ধ নিতে নিতে ভাবি
আমিও বেরিয়ে পড়বো কাল
তোমাদের চিলেকোঠা ঘরটার দিকে

তোমার শেষ চিঠিতে জানলাম
ঐ পুরোনো চটা ওঠা ঘর
চুনকামে ফর্সা হয়েছে,
ফর্সা রঙে রঙিন পর্দার জামা
মানিয়েছে বেশ,
আর তোমরা সবাই ওর নতুন প্রেমে
হাবুডুবু

এইসব ভাবতে ভাবতে
একটা করে বিকেল যায়
আগামী বিকেলের অপেক্ষায়
চিবুকে মরচে পড়ে।

এবার সব ছিড়েখুড়ে মেঘ-জল-কান্নায়
দুঃস্থ শরীর
কাল ঠিক উড়ে যাবে তোমাদের কাছে।

নিতাই জানা

ছো ট না গ পু রে র ভো র

উৎসর্গ : বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

মুখোশের মতো তবু মুখ
যে রকম আয়নায় আমি
ভেসে উঠছি অবিকল ভেসে উঠছে একটি মানুষ
অথবা একটি বাঘ অথবা একটা গোটা দেশ
খিদে পেটে নেচে যায় যেন ঝুমঝুমি
আরেক গ্রহের থেকে আলো এনে সাজিয়েছে হারানো স্বদেশ
আলো এনে খুঁজে পায় রক্তকরবী
ভাঙা লোহালক্কড়ের মধ্য থেকে মুখটি বাড়িয়ে
ফুটছে একটি ফুল, আমি দেখি : ঈশ্বর না কবি
জঙ্গলে বেঁধেছে বাসা রক্ত দিয়ে লিখে যায় কথা
রক্তের অক্ষরগুলি রক্ত পেরিয়ে
সুচ ও সুতার টোপো গ্রামের মেয়ের মতো বুনে রাখে কাঁথা
কাঁথার নকশা জুড়ে বাঘ-সাজ মানুষের নাচ
যেরকম থালা থেকে দ্রুত হাতে ভাত ওঠে মুখে
যেন আরো দ্রুত হাতে মানুষের সাজ
টেনে ছেঁড়ে : মুখোমুখি জান্তব বাঘ
কে যেন হারিয়ে গেল কাকে ফেলে কি এক অসুখে
নকশী কাঁথার মাঠে কান্না নাকি রক্ত চাপচাপ
ঢুলি ঢোল পিটে চলে বাঘ নাচে যেন
ঢোল বাজে যেন কোনো পাগলের মতো
ঢোলক কাঁপছে যেন লোকগুরু প্রশ্ন করে : কেন কেন কেন
জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো তারাগুলি জড়ো হয় রাতের আকাশে
একটি কুকুর ছোটে লাল চোখ যেন শত শত
শিখা তোলে দাবানল ; যম ও মানুষে
দড়ি টানাটানি চলে দিন রাত্রি মাস
দড়ি টানাটানি চলে প্রতিটি বছর
বৃষ্টি আর নদী জলে ভেসে যায় শ্বাস আর আশ

ডোঙাটি ভাসায় জলে ঢেউ ওঠে দুলদুনির মতো
ঢেউ তোলে গ্রামদেশ ঝড়
কুপী জ্বলে কেঁপে কেঁপে আলো যত ধোঁয়াও ততো
যেন রোষ কান্না মোড়া ফসলের জমি
আলো আর অন্ধকারে খেলা করে ঘরের ভেতর
আলো আর অন্ধকারে যেন বনভূমি
ভোরের একটু আগে খুঁজে পায় রং আর তুলি
জল ও মাঠের বুকে ডোরাকাটা বাঘ গরগর
পেশির ছন্দ তুলে একটি মানুষ নাচে পাশে পাশে ঢুলি

নাসের হোসেন

প্র থা

প্রতিটি জিনিস, জীব জড় দৃশ্য অদৃশ্য সবই
প্রকৃতির আশ্চর্য সৃষ্টি
ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত কেউই একদিন
বেঁচে থাকবো না
জন্ম এবং মৃত্যু—এক স্মরণাতীত প্রথা
যেন পুরীর সমুদ্রতীরে ঢেউ-এর উত্থান পতন
এই সৌন্দর্যকে আমরা সমুদ্রতীরের প্রথা বলে
ডাকতে পারি

আ র এ ক ঘ ণ্টা প রে

গতরাত্রে আমার বেশ মাথাব্যথা হয়েছিলো।
সাহসী যুবতী অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে গেলো
যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।
পৃথিবীতে মানুষের আয়ু খুবই কম।
প্রকৃতি এত রহস্যময়।
সূর্যের রশ্মিকে ভাগ করলে সাত-সাতটি রঙ
পাওয়া যায়।
আর এক ঘণ্টা পরেই হয়তো আমি মারা যাবো।
দোহাই তোমাদের, আমাকে ক্ষমা করো।
এখন আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

নি জে দে র ই

বিবেকের তাড়নায় কখনো কখনো
অপ্রিয় সত্যও বলতে হয়।
আমি এ-কাজটি করি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই,
বলা যায় ভদ্রতার খাতিরে।
ঝামেলাগুলো আসলে আমি নিজেই পাকাই।
আমার কেবল বলবার ছিলো তোমরা অন্যের ক্ষতি
করতে গিয়ে নিজেদেরই ক্ষতি করছো।
পাখিটা আপনমনেই উড়ে গেছে দূরের গাছে।
এখন আমাদের সমস্যা আমাদের নিজেদেরই
মিটিয়ে ফেলতে হবে

নিভা দে

প্রৌঢ় প্রেম

প্রেমও প্রৌঢ় হয়....যাই-যাই কবে তবু থেকে যায়
অদ্রকুচি কিছু বিশুষ্ক ডালে। কদাচিৎ নিভন্ত রক্তস্রোত
কথা বলে ওঠে! বাকী সব গাণিতিক হিসাব-জ্যামিতির
ছকে বাধা আঁকিবুকি। শাস্ত্র মেনে কথা বলা অপেক্ষায়
থাকা—পাশাপাশি বসে ডায়েরীর পাতা ওল্টানো
সমতালে পা ফেলে ফেলে জীবনের মানে খোঁজা

প্রেমও প্রৌঢ় হয়। ললিতকলা ভবনে আর ঝড় ওঠে না
দুরন্ত ঘূর্ণিতে। বৃষ্টিও আসে না বন্যার ভয় আঁচলে বেঁধে
প্রৌঢ় প্রেম গলায় দুলতে থাকে অভয় মাদুলির মতো
শীতেও কাঁপেনা—বসন্তেও জ্বলে না অরণি কাঠের মতো

বিস্বাদ বিষাদ-সিন্ধু

বিস্বাদ বিষাদে চোখের পাতা ভারি হয়ে আছে—
কোণে কোণে শ্রাবণের মেঘ—বিষাদে ঝুলে আছে—
বিস্বাদ বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি বিষাদকে জড়িয়ে
ঘুম থেকে উঠে দেখি—চারদিকে বিষাদের কাঁটালতা
বিষাদে নিঃশ্বাস নিই—বেঁচে থাকি বিষাদে—
বিষাদ মন্ত্র জপি দিনরাত—বিষাদ ঠোঁটে—
বিষাদে চলি ফিরি—অঙ্ক কষি—বিষাদ সিন্ধুতে
সাঁতার কাটি পারাপার নেই জেনে—তবু—

বিষাদ পান করি—বিস্বাদ মন্থর উদাসীন হাতে—
বিষাদ কুন্ডলী পাকিয়ে আছে কেউটের মতো
সারা অঙ্গে জ্বলে পুড়ে গেল—বিষাদ গরলে—
বিস্বাদ করাতে কাটে প্রতিদিন এ জীবন পলে অনুপলে—।

নীলাঞ্জন সিংহ

আমার চেতনা চৈতন্য করে দে

এবার ছুটিতে সবাই বেড়াতে যাবো—
আমার সঙ্গে থাকব কেবল আমি,
এবং থাকব আমার সঙ্গে আমি।

যেখানে চলেছি আগেও গিয়েছি আরো;
দূর থেকে শুধু কাজল বনাঞ্চল
মনে হয়। আর কাছে গেলে শুধু দারুণ কৌতূহল
বারবার জমে, বরাবর হয় গাঢ়;
যেখানে চলেছি আগেও গিয়েছি আরো।

যতবার গেছি প্রতিবার কিছু কাজ
বাকী থেকে গেছে। কাল হবে থাক আজ—
এই ভেবে ভেবে শেষ হয়ে গেছে ছুটি
পুরো কাজটাতে সামান্য কিছু ত্রুটি
রয়েই গিয়েছে, এবার সারবো ঠিক
ভ্রমণ নিঙড়ে সাজাবো চতুর্দিক;
এবার সাজাবো গুছিয়ে গুছিয়ে নিজে
সাজব সাজাবো ওদের সঙ্গে ভিজে—
যে পাখীরা ক্রমে গান গেয়ে মিশে যায়
তাদের ধরবো বুকের মধ্যে গাঢ়,
যেখানে চলেছি আগেও গিয়েছি আরো।

প্রণবকুমার মজুমদার

দেয়ালের মধ্যে

দেয়ালে দেয়ালে ঘেরা এই ঘর
মহাশূন্যকে এভাবেই বিভাজন
এভাবেই একা হয়ে থাকা
যন্ত্রণাকে সীমাবদ্ধ রাখা

ক্রমশ ছোট হচ্ছে পৃথিবী
উপদ্রবে লাঞ্ছিত মহাকাশ
এক চিলতে ছাত পায়নি ছাড়
এ যন্ত্রণা কোথায় রেখে আসি

দেয়ালে দেয়ালে ঘেরা এই ঘরে
সূর্য গ্রহণ টানা বারোমাস
চোখকান জোড়া হাত পা
ক্রমশ বধির ক্ষীণ হয়ে আসে

তাও কখনো গ্রীলের ফোকর গলে
প্রবাসী ভ্রমর আসে স্বল্প সফরে
বিপরীত জানলায় মুহূর্তে ফিরে যায়
যন্ত্রণার ঢেউয়ে পারাপার করি আমি

জলের কাছে

শীতল জলের কাছে যেতে দাও
ধুয়ে নেব একবার চোখের দহন
প্রাকৃতিক দৃশ্যে শুধু বাষ্পজ্বালা
দুহাতে করেছি সাফ অরণ্য গহন

লোভের শরীরে লগ্ন থাকে গুরু পাপ
হিংসার ছাইয়ে থাকে লঘু অনুতাপ

মৃত্যুতে মরে না তার নাম
স্নায়ুর ভেতরে ধূর্তকাম

খুবই জরুরী এখন শীতল জলাশয়
মেঘের কাছে যাবো প্রার্থনা জানাতে
দহন জুড়োতে অবগাহনেই যেতে হয়
দিঘিটি গাভীন হবে মেঘের হানাতে

মৌলি মিশ্র

চিঠি

এবার পাহাড়ে উঠে, তোকে কী বলব চূর্ণী, অদ্ভুত সবুজ এক
মানুষ দেখেছি আমি। আমার হাত ধরে সে পেরিয়ে গেছে
সঙ্কীর্ণ চড়াই উতরাই; স্বচ্ছ নীল দোপাট্টার মতো এলানো
যমুনার বুক খুঁড়ে সে এনে দিয়েছে অলৌকিক সাতরঙা নুড়ি।
আমারই জন্যে সবুজ সেই মানুষ মৃত্যুকে ডানহাতে মুঠো করে
দক্ষ বামহাতে কেটে এনে দিয়েছে প্রশস্ত বৃক্ষের ছাল:
তাতে নাকি চিঠি লেখা যায়!

আমার জন্যে; হ্যাঁ চূর্ণী, আমারই জন্যে।
বিনিময়ে কিছু চায়নি সে আমার দুই চোখ হাসি ছাড়া।
সমতলে নেমে একরাত্রিও পোহায়নি, এসেছিলো সেই মানুষ:
সবুজ রঙ নেই একফোঁটা, সর্বাঙ্গে হলুদ আমারই মতোন;
ক্রুর দৃষ্টি হেনে ডানহাত মেলল সে: পাওনা নাকি অনেক বাকি!
আশ্চর্য চূর্ণী, পাহাড়ে ওই হাতেই তার ধরা ছিলো মৃত্যু....

আমারই জন্যে তো!

অমরেন্দ্র গণাই

আর এক মন্দির

শিউলির নির্জনতা ছোঁয় নি তোমাকে।
জ্যোৎস্নার কনক চাঁপায় সাজালে না
তোমার অলক। মালতীর নিভৃত আঁচলে
গন্ধের ভাসান সন্ধ্যার নদী হতে পারে—
সে কথা জেনেও ঝরালে শ্রাবণ দুই কূলে?
যে কোন মুদিত কলি—সমর্পণ;
কেন তবে ভাসালে সাগরে নৌকা?

শিউলির নির্জনতা, চাঁপার ব্যাকুল বর্ষা,
মালতীর স্ফুরিত বিস্ময়—
অবগাহনের আর এক মন্দির জেনেও
অনায়াসে দূরে চলে গেলে?

কৃষ্ণসাধন নন্দী

মই

দু-একদিন চলতে পারে
হাপিতোশ তারপর

উঠতে নামতে
নামতে উঠতে
পায়ে দাঁড়াতে
একটা বানানো ভালো

যেমন তেমন হোক
নিজের বলার
তরতরিয়ে না হোক
থেমে থেমেই

তবু বলবো আমার একটা মই ছিলো
আমি তা বেয়ে উঠেছিলাম কিছুদূর।

শ্যামলজিৎ সাহা

ঘুম ভাঙালাম

ঘুম ভাঙালাম ক্ষয়িষ্ণু আরাম, জাগো।
রিপু যন্ত্রণার কথা ভুলে হংস আনো।
বাইরে হ্রদের ধারে বীজ তৈরী আছে,
আজ সবটুকু তার বুনে নিতে হবে!
উর্বর মাটির মধ্যে লাফিয়ে নামছে
ট্রাকটর, চেপে রাখা তোলপাড় শব্দ!

বীজ, তোমাকে প্রবল চাই ভরা শস্যে—
এই বাণী ফাঁকা মাঠে আছড়ে পড়েছে।
তখনই ঝড় ওঠে, তবু ভয়হীন
নিজেকেই আরো শুকিয়ে ছড়িয়ে নাও।
ঝড় গেলো, হ্রদ পাড়ে মাটি তৈরি করো,
সারাদিন একা ঘুম-ভাঙা গান গাও।

মেঘেরা উজ্জ্বল হয়

মেঘেরা উজ্জ্বল হয় প্রকৃত বাতাসে।
মহাশূন্য থেকে এক ঘোর নেমে আসে।
গাছগুলি দোলে, পলাশ স্তম্ভিত হয়,
আমি দেখি একসঙ্গে জল, আকাশ ও ভয়।
শুয়োর চরানো দিন আরো অন্ধকার,
পীড়িত চমক মনে তোলে পাঁচবার
প্রশ্ন—কোন মেঘ, কোন্ অস্ত্র ব্যবহারে
মানুষেরা শেষ হয়ে যাবে বারেবারে!
তারপরে শুধু ত্রাণ, ধাক্কা দেবে প্রাণে
গৃহহীনদের জন্য প্রশ্নাতীত টানে
নিজেরা জড়িয়ে যাবে। নির্মাণ প্রকল্পে
মনোযোগী হবে, ভেঙে পড়বে না আলো।
মেঘেরা উজ্জ্বল হবে প্রকৃত বাতাসে,
মানুষ আবেগহীন, মানুষই হাসে।

সন্দীপ্ত মাজি

ভারতবর্ষ

চায়ে অতিরিক্ত চিনি : ব্লাডসুগার।

ক্রমশ শর্করা বেড়ে যায়,

চিনি খেতে বারণ করছে ডাক্তার।
কিন্তু, কে শোনে কাহার কথা! কে শোনে?

চিনিকলমালিকের সঙ্গে এই গৃহকর্তাটির
গোপন আঁতাত হয়েছে।
ঝান্ডা খুব উঁচু করে তুলি।

আন্দোলন সেরে স্নান, কিছু মিষ্টিমুখ।

হাই ওঠে।

পাড়ার ড্রেনের জল গিয়ে পড়ছে নদী ও সাগরে।

দৃষ্টিভাষা

মধুদৃষ্টিভাষা যেন
পদ্মের পাতায় ধরা জল।
আঁজলা ভরে নিয়ে গিয়ে
কতজন
অনাদরে ফেলে দিল
        বদ্ধ জলাশয়ে
তবু দৃষ্টিভাষা, তুমি চাতকের মত
বারি যাচ'। লজ্জাহীন
মধুদৃষ্টিভাষা তুমি ভালো জানো
        তোমার নিয়তি
তবুও নিস্তার নেই
অনন্তজীবন শুধু
চোখ থেকে চোখে ভেসে চলা....

স্বপন শর্মা

দরোজা

অন্ধকারে দরোজাটা খুঁজি
যেখানেই হাত পড়ে শুধু
অদেখা দেয়াল
সে দেয়ালে পালকের গন্ধ।

তবে কি অশ্রুত সুর কোথা থেকে এসে
দরোজা জানালা ভেদ করে ঢোকে
জানবো না?

জোনাকীর আলো:
তার মাঝে দাঁড়ানো ছায়ার মত
কিছু দেখে
ছুঁয়ে ফেলি; দেখি দরোজাটি তুমি।

মেঘ মুখোপাধ্যায়

সমুদ্র ফেনার চিত্রকলা

সরে যাওয়া জলে ভাসে
ভেঙেপড়া সমুদ্রফেনার চিত্রকলা

জল সরে
জল সরে

হুহু বেগে ফিরে যায় সমুদ্রের দিকে
ততক্ষণে আর একটি ঢেউ

আর একটি ঢেউ উঠে ধেয়ে আসে
তরুণ দম্পতি হেসে কুটিকুটি
তাদের পায়ের তল থেকে বালি টেনে
নিয়ে যায় সরে যাওয়া জল

বৌটির গা শিরশির করে

সার বাঁধা দেহাতির দল মন্ত্র পড়ে
গান গায়
ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হলে হেঁট হয়ে
সমবেত প্রণাম জানায়

তাদের কঠিন কালো
প্রজ্ঞাবান পাগুলিকে ঘিরে
ভেঙে পড়া সমুদ্রফেনার চিত্রকলা
কাণামাছি খ্যালে

ঈশিতা ভাদুড়ী

ও ল ট পা ল ট ছ ত্রি শ ব ছ র

আয়নায় রেখেছে মুখ আমার ছত্রিশ বছর বয়েস। ওঘরে খেলা করে
হাতে গ্লাস অবোধ শিশু। সে শোনে নি পাখীর গান। সে আমার
মৃত সন্তানের পিতা। সে দেখেনি শিশিরে ভেজা ঘাস, রাধাচূড়া ফুল।

এইভাবে ম্লান লণ্ঠনের শিখায় ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায় দোমড়ানো মোচড়ানো
একেকটা সকাল, একেকটা রাত, আমার ওলটপালট ছত্রিশ বছর বয়েস।
অতীতে কি আছে, কাঞ্চন আলো? তীব্র ভালবাসা? চাঁদিপুরে পূর্ণিমা
জেনেছে অশ্রুজল।

ছবি ও জীবন বিষয় কথা হোলো যার সাথে সে রইল দূরে, মাঝখানে
এ ভুল সিঁদুরের চিহ্ন!.... অন্ধকার কালো রঙ টের পেতে দেয় নি
আমার পিতার প্রাচীন চিন্তা, পণপ্রথার মতো গোপন লজ্জা।

ঘরদোর হয়নি আমার। তবু চিলেকোঠা পেরোতে দেয় নি আমার স্বামীর
মুখ।.... এই বিকেলে আজ হেঁটে যেতে যেতে আয়নায় কে আমি!
জলে ভেজা চোখ, আঁচলে সন্তান স্নেহ, ওলটপালট ছত্রিশ বছর।

স্বরূপ চন্দ

ব ল ছি না

যোগ ও বিয়োগের মতো নিজস্ব নিয়মে
চলেছে সময়। সময়ের পা নেই, গতি আছে।

গতিহীন জীবন মানে আন্দোলন শূন্য স্থবির সময়
যদিও রক্তপাত কাম্য নয়; তবু মনে পড়ে—
"রক্তের ভিতর দেখা হলে মনে থাকবে অনেকদিন।"

সেই থেকে আমি লাল রুমাল সংগে রেখেছি
বিদায় সম্ভাষণের সময় সেই রুমাল নেড়ে বলেছি
তাহলে দেখা হবে। 'মনে-রেখো' কথাটা আর বলছি না।

সা ম্প্র তি ক

যেমন সিঁথিতে সিঁদুর, নাকে নথ
পায়ে তড়া আলতার রক্তিম শোভা; কোথায় হারালো
দেশগাঁয়ের পরিচিত বধূ। এই সব ভাবি।
আমার সাত পাঁচ চিন্তার ভিতর খেলা করে

এক দামাল শিশু। নদীকে শুধাই—
নদী বলে জানি না। শুধু রহস্যময় হেঁটে চলে যায়।

ওগো কান খাড়া পাঁচমুড়ার ঘোড়া;
তুমি না এলে আমাদের গ্রামের পথ ফাঁকা থেকে যায়।

আর যদি না আসো; কে শুনবে নির্জন দুপুরে
বাসন মাজার ধ্বনি। যে মেয়েটি একা রয়েছে রান্নাঘরে

তার অন্ধকার জীবনের কথা। ও ঘোড়া ছুটে আসছো না তবু।

পরে যেও

সকাল বেলার ট্রেন চলে যাচ্ছে পুরুলিয়ার দিকে
প্রতিদিন এই এক দৃশ্য দেখে বিষণ্ণ হয়ে পড়ি

ইচ্ছে হয় ঘুরে আসি। পুরী অথবা গোপালপুর
অথবা কাছে পিঠে অন্য কোথাও।
নিদেন পক্ষে বন-জঙ্গলে ঘেরা কোন নদীর তীরে
দু-চার জন বন্ধু মিলে চড়ুইভাতি।
ডেট ফিক্স, ক্যামেরা, ওয়াকম্যান রেডি, হঠাৎ
দলের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে কে গাইবে রবীন্দ্র সংগীত।
প্রেমে ব্যর্থ যুবক; তাই রানীবাঁধ অথবা ঝিলিমিলি প্রেফার করি,
দুদিন মহুয়া আর মাদলের তালে তালে নাচ গান হবে
এই ভেবে বাসে উঠতে যাচ্ছি; এমন সময় পিছন থেকে কে যেন টানছে
বলছে: দু-চার দিন পরে যেও, ওদিকে এখন ভীষণ শীত।
দু-চার দিন কেটে গেল পুরনো তারিখ নতুন হয়ে
এলো আবার। তবুও যাওয়া হল না
এবার পকেট বলছে: আমি এখন খালি, পরে যেও

সেবাব্রত চৌধুরী

নদী

কিশোরী নাতাশা,
বাল্যকালে ছিলো ভালোবাসা,
সখি, ভালোবাসা কারে কয়
সে কি কেবলি বিবাদময়,
এলো যুদ্ধ, দাঙ্গা, বন্যা, এলো মন্বন্তর,
দেশবিভাগ, ছিন্নমূল শনির প্রহর,
তারও পরে বেঁচে থাকে যারা
তারা কেউ ভুলে যায়, কেউ রাখে মনে—
নাতাশার হাসি গান নাচ আত্মহারা
আবেগে মননে,
নদীতো ভোলেনি তোরে কিশোরী নাতাশা
বাল্যকালে ছিলো ভালোবাসা
একদিন দেখা হবে নামহীন নদীর কিনারে
মনে আছে আশা।

মনপবন

সকলেই বাড়ি ফিরে গেছে
বাসস্টপে বালক ও শীর্ণ কুকুর
হাওয়ায় উড়ছে ওই বাদামের খোসা
দিগন্তে মিশে যায় ধুলোর দুপুর
ছাগশিশু কোলে নিয়ে গাঁয়ের কিশোরী
মিশে যায় ধান আর বাতাসের দেশে
এক দিন শেষ হলে আরেকটা দিন
রাতের আঁধারে জাগে স্বপ্ন-রঙিন
ব্যথিত কুকুর ডাকে আকাশের দিকে
বাসস্টপে নেমে আসে মনপবনের নাও
বালক ও কুকুরটি ভেসে চলে যায়
বাদামের খোসা ওড়ে ধুলো ওড়ে হাওয়ায় হাওয়ায়....

হায় হায়

জামালপুরের মেয়েটি গান গায়
এত সুন্দর, এত সুন্দর দেখতে,
ওর কী হবে! হায় হায়, কী হবে!
বিয়েবাড়ীতে সবারই নজর ওর দিকে,
বয়স হয়নি, সামলাতে পারছে না,
তবু সাড়ি পরাবে মা, নিজেরও ইচ্ছে বই কি,
সবাই সেজেছে নিজের নিজের মতো—
উজ্জ্বল আলোর নীচে উজ্জ্বলতর,
কিন্তু ওর কী হবে! জামালপুরের মেয়েটির!
ও তো ওর মতো নয়। এখনো ফুটি ফুটি,
কনে দেখা আলো কেন ফেলছো ওর মুখে
ছেলের মায়েরা সব নজর রাখছো
কে কার আগেই, হায় হায়, পেড়ে ফেলবে
রঙিন কাগজে মোড়া অপক্ক ফলটি
এত সুন্দর এত সুন্দর হায় হায়
জামালপুরের মেয়ে গান গায়....

সুব্রত সিন্‌হা

কদম

শ্রাবণের মুখভার বিকেলে গতজন্মের কদম ফুটেছে
সমস্ত গন্ধ-মহিমা
একটিবার সংহত করবার জন্যে

বহুদিন, সে-সব কবেকার ব্যক্তিগত চিঠিগুলি, জীর্ণ
হয়, বয়স বাড়ে

স্তব্ধ কদমতরু পলকহীন তাকিয়ে—অসহায়!

কথা

দুঃখ পাওয়া, ওকে খুশির চুম্বন দাও
অনেকগুলি মুখের ভিড় থেকে
কে ক'রলো অমন নিপুণ ভ্রূকুটি?

চৌমাথার মোড়ে কথা ব'ললে তর্ক শুরু হয়।
কোনো তর্ক-ই বিনম্র নয়।
সব কথা ডুবে যায় বৃষ্টির আগে।
মেপে মেপে ব'লতে গিয়ে হৈ হৈ হেসে ওঠা
সব কথা এলোমেলো হ'য়ে যায় সম্পন্ন বাতাসে।

স্তনপরী

অমলতাসের ছায়ায় বোঁটাটুকু ঘুমায় শান্ত
পুকুর-পারে কাতরভাবে ডাকছে হলুদ রঙের পাখি
দূর থেকে কেঁপে ওঠে সদ্যযুবকের চোখের পাতা
সার্থক হয় দু'নয়ন

জলের গভীর থেকে উঠে আসে একাকী স্তনপরী

প্র ভু দা স

শ্মশানে যাও প্রভুদাস
রতিস্খলনে কোনো পাপ নেই
যতটা পতনযোগ্য ভালোবাসায়

জ ন্ম ক থা

সদ্যযুবতীর কোমর জড়িয়ে নেমে যাচ্ছি
স্নেহছায়ার নিবিড় পাতালে ;
কন্যার মায়ানাভিতে মগ্নময় স্নান :
অবগাহন শেষে দেখি
শরীরময় কুহক বিস্মৃতির ছায়া

ভ্রূমধ্যে ভেসে উঠছে উচ্ছ্বল পূর্ণিমা।

প্রদীপ মিত্র

জ ন্ম দি নে র ক বি তা

নৈঃশব্দ্যের ভিখারী রাত চেনে। ছবি আঁকে। রাত্রির বয়স জানে না।
দু'হাতে মুখ তুলে চুম্বন করা হয় না।
ঋণ থেকে যায়। পৃথিবীর আলোর কাছে। জন্মজড়ুলের কাছে।

ঘুম ভাঙে। ভোর হয়। ভোর নয়। সকালের পর সকাল হয়।
ঘুম ভাঙে না। ভাঙায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠবর্ষের সাহিত্যের ছাত্রটি।

তাকে একবছরের পুরনো কবিতা শোনায়। কবিতার বিবর্তন নিয়ে কথা হয়।
কূটতর্কে ও জিজ্ঞাসায় জড়িয়ে যায় শব্দগুলি।
অথচ বছরটির বিবর্তন বিষয়ক কোনো কথাই হয় না।

আরেক বিবর্তনের দিকে শব্দহীন গড়িয়ে যায়—
আমাদের যাবতীয় শব্দাবলী, ক্ষয় ও জোছনার প্রতিরূপ।

অমৃত সাহা

ফ টো

যতবার ফটো তুলি
আমার চেয়ে আমার ফটো সুন্দর হয়

যতবার ফটো তুলি
আমার নতুন ফটোর সঙ্গে
অ্যালবামের সমস্ত ফটো মিলিয়ে মিলিয়ে দেখি

চৌষট্টি পাতার অ্যালবাম জুড়ে
আমার চৌষট্টিখানা ফটো

কেউ কারুর মতন নয়

স ভ্য

বড় প্রিয় ঘর, সুখী ও সুরম্য
পাপোষে পা মুছে এসো
ঢোকবার আগে পর্দার ওপিঠ থেকে
শব্দ ক'রে এসো, প্রতিবার

কারো সামনে আমরা অসভ্যতা কখনো করি না

গৌতম দাস

ন ত জা নু চি ত্র

কল্পচিত্রের মত নিভৃত
চুম্বন মরমে জেগে আছে
আমাকে যতটা দিলে তুমি
তারও চেয়ে বেশি রয়ে গেল
শ্বাসের প্রাধান্যে, প্রতিষ্ঠায়—
লহমায় রক্ত যায় দ্রুত
তোমাকে অমর করে নিতে
আমি মরে যাব কবিতাদি
আমার বাস্তব চারিভিতে
খুঁটে-খুঁটে তোলে প্রতিবাদী....
আমার বাস্তব যাকে জোড়ে
প্রত্যেক দিনান্ত আর ভোরে

আমি তো রচনাকার নই
আমাকে রচনা করে বীজ
আমাকে তাবিজ করে পরে
বিশ্বাস ভূমিকা-বৃত্তে ঘোরে

রব ওঠে ভালবাসা ওই....
ঢেউ-এ ঢেউ মিলেমিশে রই
বৃহৎ ভাবনায় থাকে পাপ
সাপ ঢুকে পড়ে অন্ধকারে
ফোঁপানীর শব্দ বাড়ে আরো—
'মারো মারো মেরে ফেলো ওকে'
আমি মরি আমি মরে যায়
বেঁচে উঠি গুরু তাড়নায়।

সারাটা জগৎই আধো বোল
আধো-আধো জাতীয় বিকারে
ভরে আছে ; বায়ু তার ঘাড়ে

বসেছে নেশায়, বিকশিত
ভয় হয় ভক্তি হয় পিরীতিও
বোঁটায় বোঁটায় জমে ওঠে
ঘূর্ণি বাতাসে জাগে বিস্ময়
তবে তুমি বলো, নিবিড়তা
সাঙ্গ কেন হবে, কেন রবে
কথকতা শুধু অপ্রতিভ ?
কথায় কথার কলি নিই
নিদ্রাহীন তুমি কবিতাদি।

'স্পন্দিত হব একটি চুম্বনে
এক বাহুডোরে কালান্তর
কবিতাদি তার মনে মনে
কবিতাদি যার স্বয়ম্বর'

চাঁদ ভেঙ্গে ঢুকে গেছে চোখে
সূর্য নাভিকেন্দ্রে জ্বলে যায়
রক্তে-রক্তে তাড়নায় ছুটি
তাড়না অপাপ লহমায়
লোকালোক : অতিক্রমণের
ক্রমান্বয় : অতিস্বর ভেদে
ক্রমোজোম : অতি সৌরধ্বনি
নতজানু ভাসি জনস্রোতে

২

কী করি কী করা যায় ভেবে-ভেবে সারা
প্রতিবেশী—অন্নভূমি গৃহস্থের পাড়া
ভঙ্গুর কাকলী ক্ষণ আলোসহবাস

কলঙ্ক কীর্তনী ঘাস জন্মের দুয়ারে
ঢেকে রাখে জগতের কান্নার বিস্তার
ঘাড় নিচু হয়ে আসে তবু ছলনায়
তুমি তবে কবিতাদি অববাহিকার
স্বপ্নরূপ, অপরাধ, স্বাভাবিক দায়

নিয়েছ আপন ক্রোড়ে—আনন্দ সংবাদ

এভাবেই মেলে দেয় ভূষণের ডানা
সিন্দুরের মুগ্ধ চিহ্ন তখনি মানায়
নিচু জল ছুঁয়ে থাকে কানা ও কল্পনা
৩.
জনস্রোত ঢুকে পড়ে ভিতরে-ভিতরে
শীতের শরীর খায় গ্রীষ্ম যেমত বা

চারণ কবির গানে শোনা যায়, 'ওরে
নিয়তি নির্ভর করে উঠেছে বাতাস....'

শোনা যায় ভূমিষ্ট শিশুর মুখে মুখে
অভিভূত তরঙ্গের অধিকার, স্বরে

মূর্ছনায়—চেতনার প্রথম প্রকাশ
পরম প্রভুর মত চুম্বনের দিন
এসেছে, কথায় নয়, আহত মাটিতে
জয় জয় যে বেচারী, জয় দুঃখ চিতে
আমি তার ভিতে রাখি মা-তারার জবা
সকল যন্ত্রণা রাখি বাদ্যযন্ত্রদেহে

তন্ত্রে মন্ত্রে ধেয়ে যায় তিরিক্ষি মেজাজ
৪.
বাদ্যযন্ত্র বাজে কত বাহানাতাড়িত
বাদ্যযন্ত্রে আলোড়িত তুমি
পদে-পদে পদাবলী রতনতনুর
ততদুর তুমি ততদুর
প্রস্রবণ প্রবণতা লোটা ও কম্বলে
ততোধিক তুমি শিহরণ
দু'চোখ জড়িয়ে আছে দিক চক্রবালে
তারও পরে তোমার বিস্ফার
উপকথা ঘুরে ফেরে অভিশাপ দিয়ে
অভিশপ্ত অভিশপ্ত তুমি

গৌতম ঘোষদস্তিদার

দুপুর

খাটের বাজুতে পিঠ
একাই ছিলে দুপুরে
সামনে ছড়ানো ঊরু
জানোনি বিষাদসিন্ধু

না জানলেই বা কী
সুখেই কাটে দিবা
জানো না সম্যক
অদ্য শেষ রজনী

রজনী ঘোর উতলা
চন্দ্রাহতের বেদনা
ছোঁবে না দিনাবসানে
আমার হৃদয়-বাসনা

যদি বা ছোঁয় হাত
ছোঁবে না করুণ চিহ্ন
জীবন মানে যে-বৃত্ত
লিখেছি তোমার ঊরুতে

জলসিঞ্চিতরভসে
রয়েছ দুপুর-বিলাসে
বাইরে খরার পৃথিবী
ডুববে রোদের পরুষে

খাটের শিয়রে চুল
একাই ছিলে দুপুরে
সামনে ছড়ানো ঊরু
জানোনি মৃত্যু সেখানে!

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

রায়

ঐ ছুটে যাওয়া সাইকেলে তোমাদের হারাধন পাল
ঘন্টি বাজিয়ে গেলো।

গাত্রহরিদ্রা হবে ছোটোমেয়েটির—বলে গেলো আমাদের,
নিমন্ত্রণ করলো না কেন, লোকেরা জানে না,
তবু চেঁচিয়ে বললো গায়ে-হলুদের কথা সমস্ত সকাল

মাঝবিত্ত বাড়ি থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিলো মুখ—
"কে যায় সাইকেলে? তাকে ডেকে আনো, ভাত খেতে দাও"
তবু হারাধন তার দ্বিচক্রচালিত যানে পালায় নিমেষে,
দুখিনী মেয়ের বুঝি বিয়ে হবে? তাতেই যে-সুখ
সে তো খুব সামান্য বিষয়। তাকে নিয়ে
বড়োরা ভাববে কেন? উপদেষ্টা আসবে কি তাতে?
আমলারা বলবে "ও!" বিচারকমণ্ডলী বেনুবনে এসে
রায় দেবে। ঠিক রায়? তখন কেঁদো হে তুমি ইনিয়ে-বিনিয়ে।